লোকধর্ম ও মতুয়া সম্প্রদায় ঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

গোপাল চন্দ্র সরদার

পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

জুন, ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

লোকধর্ম ও মতুয়া সম্প্রদায় ঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

উপস্থাপনায়
গোপাল চন্দ্র সরদার
পিএইচ.ডি. গবেষক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপক ড. নেহাল করিম
চেয়ারম্যান
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জুন, ২০১৭

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, 'লোকধর্ম ও মতুয়া সম্প্রদায় ঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি আমার একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এই বিষয়ে কোনো গবেষণা কার্য সম্পাদিত হয়নি এবং এই অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনো অংশ অন্য কোনো পত্রিকা কিংবা সাময়িকীতে প্রকাশনার জন্য বা কোনো প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী বা বৃত্তির জন্য পেশ করা হয়নি।

গোপাল চন্দ্র সরদার
পিএইচ.ডি গবেষক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

গোপাল চন্দ্র সরদার কর্তৃক পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ 'লোকধর্ম ও মতুয়া সম্প্রদায় ঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ড় পাঠ করা হয়েছে এবং এটি একটি মৌলিক গবেষণা বিধায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।

অধ্যাপক ড. নেহাল করিম
তত্ত্বাবধায়ক ও চেয়ারম্যান
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নম্বর
সূচিপত্র	III
সারণির তালিকা	V
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	IV
সারসংক্ষেপ	VIII
প্রথম অধ্যায়	
ভূমিকা	১
গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা	১
গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২
গবেষণা এলাকা	২
গবেষণা সংশিণ্টষ্ট তাত্ত্বিক ধারণা	৩
প্রত্যয়গত ধারণা	৩
ধর্ম	৩
লোকধর্ম	৪
মতুয়া সম্প্রদায়	৫
গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	
গবেষণা পদ্ধতি	৮
২.১ নমুনায়ন এবং উপাত্ত গঠন পদ্ধতি	৮
২.১.১ প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যাবেক্ষণ	৯
২.১.২ সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং সাক্ষাৎকার প্রশ্ন	১০
২.২ উপাত্ত সংগঠন ও বিশেণ্টষণ	১১
২.৩ বৈধতা এবং নির্ভরযোগ্যতা	১১
২.৪ নৈতিকতার প্রশ্ন	১১
২.৫ গবেষণা অভিসন্দর্ভের কর্ম পরিকল্পনা..	১২
২.৬ গবেষণা এলাকার তথ্য সংগ্রহের সংখ্যা, নমুনা ও সময়কাল..	১২
তৃতীয় অধ্যায়	
মতুয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশ	১৫
চতুর্থ অধ্যায়	
লোকধর্মীয় সম্প্রদায় : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা	২৩
৪.১ ধর্ম এবং ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ	২৩
৪.১.১ ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি	২৪
৪.১.২ ধর্ম সম্পর্কে ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি	২৫
৪.২ ধর্মীয় আন্দোলন ও উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়	২৬
৪.৩ উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় ও লোকধর্ম	২৭
পঞ্চম অধ্যায়	
মতুয়াবাদে লোকধর্মের প্রভাব ঃ একটি পর্যালোচনা	৩৫
৫.১ সুফিবাদ	৩৫
৫.২ বৈষ্ণববাদ	৩৭
৫.৩ বাউল মতবাদ	৪০
৫.৪ কর্তাভজা সম্প্রদায়	৪৩
৫.৫ ব্রাহ্ম আন্দোলন	৪৭
৫.৬ চার্বাক মতবাদ	৫৩
৫.৭ মতুয়া সম্প্রদায়	৫৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের বিশেণ্চষণ ৭০
৬.১ গবেষণা প্রশ্ন-১ ৭১
৬.২ গবেষণা প্রশ্ন-২ ৭২
৬.৩ গবেষণা প্রশ্ন-৩ ৭৩
৬.৪ গবেষণা প্রশ্ন-৪ ৭৪

সপ্তম অধ্যায়
গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ৭৭

অষ্টম অধ্যায়
উপসংহার ৮০

গ্রন্থপঞ্জি ৮৩
পরিশিষ্ট : ১ উত্তরদাতাগণের নামের তালিকা ৯০
পরিশিষ্ট : ২ মতুয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের জন্য প্রণিত গবেষণা প্রশ্ন ৯২
পরিশিষ্ট : ৩ মতুয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের জন্য প্রণিত গবেষণা প্রশ্নমালা ৯৩
পরিশিষ্ট : ৪ গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরণের ছবি.. ৯৬

সারণির তালিকা

১. ধর্মের ক্রিয়াবাদী এবং মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি... ৩০
২. শাস্ত্রীয় ধর্ম ও লোকধর্মের পার্থক্য ৩১
৩. মতুয়া সম্প্রদায় ও সুফিবাদ ঃ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ৬৪
৪. মতুয়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণববাদ ঃ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ৬৫
৫. মতুয়া সম্প্রদায় ও বাউল মতবাদ ঃ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ৬৬
৬. মতুয়া সম্প্রদায় ও কর্তভজা সম্প্রদায় ঃ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ৬৭
৭. মতুয়া সম্প্রদায় ও ব্রাহ্ম আন্দোলন ঃ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ৬৮
৮. মতুয়া সম্প্রদায় ও চার্বাক মতবাদ ঃ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ৬৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইতিহাসের কোনো কোনো ঘটনা সমগ্র জনসাধারণ অথবা গোটা জাতিকে নাড়া দেয়; সমাজে, অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে কিংবা মননে এমন ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যা সবকিছুতে অতিক্রম করে যায়। এ ধরণের একটি ঘটনাই হচ্ছে মতুয়া আন্দোলন। মতুয়াদের সামাজিক আন্দোলনে এমন সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংঘটিত হয়েছিল যা একদিকে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সমগ্র অন্তজ জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল; অন্যদিকে তৎকালীন সমাজের বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ আত্ম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল, যার মাঝেই খুঁজেছিল জীবন জীবিকার এক সুন্দর ভবিষ্যৎ। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও তৎকালীন অখন্ড বাংলায় বসবাসকারী সমগ্র বাঙালি এমন প্রতিবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে যে, শত অত্যাচার, নির্যাতন, নিস্পেষণ উপেক্ষা করে তারা ব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে মরিয়া হয়ে ওঠে। সমগ্র বাংলার জনসাধারণের মুক্তির সংগ্রাম, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং শোষণ মুক্তির সংগ্রাম কিভাবে সমন্বিত হয়েছিল এবং কিভাবে তা সামাজিক আন্দোলনের দিকে মোড় নিতে থাকে তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্যই এ গবেষণার সূত্রপাত।

গবেষণার শুরু থেকেই আমি অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি। এদের কারো কারো সহযোগিতা এমন ছিল যে, যা না পেলে এই মূল্যবান গবেষণা সূচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হত না। এদেরই একজন হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. নেহাল করিম, চেয়ারম্যান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি আমাকে গবেষণা বিষয়ে ব্যাপক উৎসাহ এবং নানাভাবে সহযোগিতা ও জ্ঞান দান করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণা ও একান্ড় আগ্রহে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আমাকে বিভিন্নভাবে আন্তরিক সাহায্য প্রদান করেছেন। তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং গবেষণা অভিসন্দর্ভের সূচি তৈরীতে তিনি আমাকে সাহায্য না করলে গবেষণা কার্যের সামগ্রিক কর্মকান্ড সুচারুরূপে পরিচালনা করা দুরুহ হয়ে পড়ত। একাডেমিক কাজের শত ব্যস্ড়তা সত্ত্বেও তিনি আমাকে সঙ্গ দিয়ে, তথ্য দিয়ে এবং ধৈর্য্য সহকারে অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ড় পাঠ করে সহযোগিতা করেছেন। তিনি বারবার আমাকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর আন্ড়রিক সাহায্য ও আশীর্বাদ ছাড়া আমার পক্ষে একাজ করা সম্ভব হত না। এ জন্য শ্রদ্ধেয় স্যারের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

আমি আরও ঋণ স্বীকার করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি বিশেষত যাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও পরামর্শ আমাকে ধন্য করেছে। এছাড়া খুলনা জেলার মির্জাপুর, লবণচরা, দাকোপ, বটিয়াঘাটা এবং ডুমুরিয়া অঞ্চলের গ্রাম ও শহরের নানা শ্রেণির অধিবাসিরা বিভিন্নভাবে আমাকে তথ্য সমৃদ্ধ করেছেন। তারা তাদের মূল্যবান সময় দান করে আমার গবেষণাকে সম্মৃদ্ধকরণে সহায়তা করেছেন। এ জন্য তাদেরকে জানাচ্ছি আন্ড়রিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সার্থক রূপায়নের জন্য আমি যে সমস্ড় প্রতিষ্ঠানের কাছে কৃতজ্ঞঃ সেগুলো হলো- সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, আগারগাঁও, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার; কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা; বাংলা একাডেমি; জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) গ্রন্থাগার, ঢাকা; সমাজবিজ্ঞান সেমিনার লাইব্রেরী (ঢা.বি.); জহুরুল হক লাইব্রেরী, স্যার এ.এফ. রহমান হল লাইব্রেরী (ঢা.বি.); সাতক্ষীরা সরকারী গণগ্রন্থাগার এবং সাতক্ষীরা পাবলিক লাইব্রেরী অন্যতম।

পারিবারিকভাবে আমার দুই ছেলে যথাক্রমে কৌশিক ও জয় দীর্ঘদিন তাদের পিতৃ স্নেহ বঞ্চিত হয়ে যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তার বিনিময় মুল্য কোনোভাবে দেয়া সম্ভব নয়। আমার সহধর্মিনী শিখা রাণী আমাকে নানাভাবে সাহস, উৎসাহ এবং সাংসারিক কাজে নিরাবচ্ছিন্ন যে সহযোগিতা করেছেন সেটি সকল প্রতিদানের উর্ধ্বে। আমার বৃদ্ধ মা-বাবা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয়-স্বজন বিভিন্নভাবে আমার সান্নিধ্য ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এ ছাড়া দুর্ঘটনা প্রবণ ঢাকা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক প্রতি মুহূর্তে গবেষণা কর্মটিতে ঝুঁকিতে ফেলেছে। এতদসত্ত্বেও গবেষণাটি শেষ পেরেছি। তবে সংক্ষিপ্ত কলেবরে যাঁদের নাম জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উলেণ্খ করা সম্ভব হল না সেই সব শুভাকাঙ্খীদের জানাই অশেষ ধন্যবাদ। পরিশেষে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

গোপাল চন্দ্র সরদার
মোহনপুর, ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা
তারিখ ঃ ২০ জুন, ২০১৭ খ্রি.

সারসংক্ষেপ

বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন বাঙালি ধর্মভাব ও বোধে নানা মাত্রিক ধর্মাদর্শের প্রভাব বিদ্যমান। ধর্মাদর্শের এই বহুমাত্রিক প্রকার-প্রকরণ এখানকার মানুষের অধ্যাত্ম ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কখনো কখনো এই ভূখণ্ডের মানুষের ধর্মজীবন আদিম ধর্মীয় ভাবনা, আদিবাসীদের চিন্তন; কখনো বা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের অভিবাসীদের ধর্মবোধের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবর্তিত। এই ধর্মবোধে কালে কালে নানা আচার নিষ্ঠার ছোঁয়া পড়েছে। সেই সব আচার-আচরণ-কৃত্য-নিষ্ঠার উপর কখনো কখনো অধিপতি শ্রেণির আধিপত্য লক্ষণীয়। যখনি অধিপতি শ্রেণির প্রতিপত্তি ধর্মবোধের উপর প্রভাব ফেলতে চেষ্টা করেছে তখনি কোনো না কোনোভাবে ধর্মানুসারীদের অন্তর্জগতে বা অধ্যাত্মবোধে দ্রোহের সুর অনুরণিত হয়েছে। ধীরে ধীরে অবদমিত মানুষেরা আধিপত্যকে অস্বীকার এবং স্বকীয় চিন্তনের তাগিদ অনুভব করে। ফলে তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র চিন্তনের অবতারণা ঘটে। বঞ্চিতজন বা নিষ্পেষিতজনের অধ্যাত্ম ভাবনার এই স্বকীয়তা তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করে। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের চিন্তন-মনন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবনের যে ছবি আচরিত জীবন ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ফুটে ওঠে, তার সুবিন্যস্ত বিশ্লেষণ এই অভিসন্দর্ভ রচনার মূল লক্ষ্য। নানা পথপরিক্রমায় বাঙালির ধর্মীয় জীবনকে কেন্দ্র করে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে, একাধিক গোত্র-গোষ্ঠী-ধর্মানুসারীদের একাধিক ক্রিয়া-কর্মের মধ্য দিয়ে বাঙালির অধ্যাত্ম জীবন সমৃদ্ধ হয়েছে। এই জীবন বোধের স্বরূপ ও মর্মান্বেষণ অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য; কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে মতুয়া সম্প্রদায়।

গবেষণা মাত্রই বস্তুনিষ্ঠতা অর্জনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। 'লোকধর্ম ও মতুয়া সম্প্রদায় ঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভের সার্থক রূপায়নের উদ্দেশ্যে গবেষণার বিষয়বস্তু, ভূমিকা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণা এলাকা এবং সর্বোপরি গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। গবেষণা উপলক্ষে প্রদত্ত সেমিনার থেকে যে সকল পরামর্শ পাওয়া যায় তা বর্তমান অভিসন্দর্ভে সংযোজন করা হয়েছে। বিশেষ করে চার্বাক দর্শন এবং ব্রাহ্ম আন্দোলন সেমিনারের পরামর্শেই সংযোজিত হয়েছে। যদিও গবেষণাটি গবেষণা প্রশ্নের সাহায্যে করা হয় কিন্তু সেমিনারের পরামর্শ থাকায় আরও ঋদ্ধ হওয়ার জন্য গবেষণা প্রশ্নমালারও সাহায্য নেয়া হয় (পরিশিষ্ট-৩ এ দ্রষ্টব্য)।

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তিক (প্রধানত যশোর, খুলনা, মাগুরা) এলাকায় গিয়ে মতুয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করার চেষ্টা করা হয়েছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধর্মানুসারীদের ভাবচর্চার প্রকৃতি অনুসন্ধান করার প্রয়াস এই অভিসন্দর্ভে বিদ্যমান। অভিসন্দর্ভের প্রতিটি তথ্য আমার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও গবেষণা প্রশ্নের উত্তরের ফসল। যে সকল তথ্য বিভিন্ন গ্রন্থ ও ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত সেগুলো যথাস্থানে কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত সকল তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তথ্য সম্পৃদ্ধ হওয়ার জন্য যেসব গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি পরিশেষে সেগুলোর একটি গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া হয়েছে। অভিধান, বিশ্বকোষ ও পত্রিকা সূচিও যথাস্থানে সংযোজিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি মোট আটটি অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা অংশটি স্থান পেয়েছে। ভূমিকা অংশে গবেষণার ধরণ বা প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথা- (ক) মতুয়া সম্প্রদায়ের বিকাশে লোকধর্মের চেতনা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা

বিশ্লেষণ করা; (খ) লোকধর্ম এবং মতুয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ধারণা অর্জন করা এবং (গ) মতুয়া সম্প্রদায়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করা। প্রত্যয়গত ব্যাখ্যা যথা- ধর্ম, লোকধর্ম, মতুয়া সম্প্রদায়, গবেষণা এলাকা (খুলনা জেলার ডুমুরিয়ার মির্জাপুর গ্রাম), সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি সম্পর্কে এই পর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম গবেষণা পদ্ধতি। এখানে আলোচনা করা হয়েছে নমুনায়ন, উপাত্ত গঠন, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সাক্ষাৎকার প্রশ্ন, উপাত্ত সংগঠন ও বিশ্লেষণ, গবেষণার বৈধতা ও নির্ভরযোগ্যতা, নৈতিকতার প্রশ্ন, গবেষণা অভিসন্দর্ভের কর্ম পরিকল্পনা, গবেষণা এলাকার তথ্য সংগ্রহের সংখ্যা, নমুনা ও সময়কাল এবং সর্বোপরি, গবেষণা কর্ম সম্পাদনের সময় সীমা। সময়সীমা বিষয়ে একটি সারণিও দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে মতুয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও প্রসারণ এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এই সম্প্রদায় বা মতবাদের উদ্ভবকাল, প্রেক্ষাপট, প্রবর্তকের জীবন, অনুসারীদের সামাজিক অবস্থা, ধর্মাচার, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সময় গৌতমবুদ্ধ, বর্ধমান মহাবীর, উচ্চবর্গের বৈষম্যমূলক আচরণ প্রভৃতি আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দর্শন। প্রবর্তকের আদর্শিক ধারায় গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিধি এবং সমস্যাও আলোচনায় রাখা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম করা হয়েছে লোকধর্মীয় সম্প্রদায় ঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এখানে ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্থান পেয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মতুয়াবাদের দার্শনিক চেতনায় কিভাবে সংযুক্ত হয়েছে তা বুঝানো হয়েছে। এ সময় প্রাসঙ্গিকভাবে কালমার্ক্স এবং এমিল ডুর্খেইম ছাড়াও আলোচনায় চলে এসেছে এ্যান্থনি গিডেন্স, গৌতম বুদ্ধ, বর্ধমান মহা বীরসহ আরও অনেকের বক্তব্য। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মতুয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক আন্দোলনের সংশ্লিষ্টতা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে ব্রাহ্ম, বাউল, চার্বাক, কর্তাভজা, বৈষ্ণবের সাথে তার আদর্শিক সম্পর্কের নৈকট্য।

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মতুয়াবাদে লোকধর্মের প্রভাব। লোকধর্মের ধর্মদর্শন, সাধন পদ্ধতি ও সামাজিক আন্দোলন আলোচনা করার জন্য সাতটি ধর্মকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্ম সাতটি হলো সুফি, বৈষ্ণব, বাউল, ব্রাহ্ম, চার্বক, কর্তাভজা ও মতুয়া সম্প্রদায়। ধর্ম জীবনের উপযোগ নিরূপণে এই সাতটি ধর্ম যে সব বিষয়কে সত্যাসত্য প্রমাণে সচেষ্ট থাকে সেগুলো এই অধ্যায়ের আলোচনার পরিধিভূক্ত। অনুসারীদের ধর্মাচারে যে যে ক্রিয়া-কৃত্য স্থান পায় সেগুলোও এই অধ্যায়ে নির্দেশ করার চেষ্টা আছে। স্ব স্ব ধর্মকে অনুসারীদের নিকট গ্রহণযোগ্য করতে ধর্ম সাতটি যে আদর্শকে ধারণ করে এখানে সেই আদর্শের ভিত্তি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লোকধর্ম সাতটি স্ব স্ব ধর্মাদর্শকে অবলম্বন করে কিছু সাধন পদ্ধতির প্রবর্তন করে; সেই সাধন পদ্ধতির প্রকার-প্রকৃতি নিরূপণ এই অধ্যায়ের পর্যায়ভূক্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গ। সামজে কোন ধরণের অনিবার্য পরিণতিতে লোকধর্ম হিসেবে মতুয়া সম্প্রদায়ের জন্ম হয় এই অধ্যায়ে তার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস আছে। মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের বৃহৎ সমাজের সদস্য হিসেবে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কিনা বা কোনো অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ

করে কিনা সেগুলো খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজের বাসিন্দা হিসেবে বিশেষত মতুয়া অনুসারীদের সামাজিক অবস্থা-অবস্থান কিরূপ, তাদের পরিচয় বৃহৎ সমাজের ধর্মীয় পরিচয়ের সব প্রশ্নের সমাধান এই অধ্যায়ের খুঁজতে চেষ্টা করা হয়েছে। আবার মতুয়া সম্প্রদায় অনুসারীদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় কিভাবে নির্দেশ করা হয়, তাদের ধর্মকে রাষ্ট্র স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে স্বীকার করে কিনা তারও সন্ধান করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে বিভিন্ন লোকধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণ এবং গবেষণা প্রশ্নের আলোকে গুণাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের আলোকে ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মধ্যে যেসব ধর্মধারা সক্রিয় আছে সেগুলোর মধ্যকার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ এই ফল প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছে। এটি সামাজিক আন্দোলনের সাথে কিভাবে সংশ্লিষ্ট তাও দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে অষ্টম অধ্যায়ে বলা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা থাকলেও মতুয়া সম্প্রদায় সকল প্রকার অনাচার বিরোধী একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন। এটিকে কেউ কেউ নমঃশূদ্র জাগরণের আন্দোলনও বলেছেন। বাংলার লোকধর্ম বিকাশের পথে এটি ইতিহাসের অভ্যন্তরে আরেক ইতিহাস। এ সম্প্রদায়টি অন্যান্য লোকধর্মে বিদ্যমান উপাদান দ্বারাও কম বেশি প্রভাবিত। ঊণবিংশ শতাব্দীতে (১৮১২-১৮৭৮) নমঃশূদ্র কূলে মাহাত্মা হরিচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়া দর্শনের আত্মপ্রকাশ। তাত্ত্বিকভাবে হাতে কাজ মুখে নাম মূল মন্ত্র এবং প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম পালনে সম্প্রদায়ভুক্তদের উৎসাহিত করা হয়। শ্রী চৈতন্য, গৌতম বুদ্ধ, আউল চাঁদসহ লোকধর্ম প্রবক্তাদের অনুকরণে মানবতাবাদের বীজ রোপন করেন সমাজে। এ মতবাদের তাত্ত্বিক প্রবক্তা হরিচাঁদ (১৮১২-১৮৭৮) ঠাকুর এবং সাংগঠনিক ও প্রায়োগিক নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭)। একটি নিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী চেতনার ধারক ও বাহক মতুয়া আন্দোলন। পরিশেষে বলা যায় মতুয়া সমাজ সুফি-বাউল-বৈষ্ণব অথবা কর্তাভজা আদর্শ মিশ্রিত মানব প্রেমিক এক বিপ্লবী সম্প্রদায়। উপরন্তু পরবর্তী গবেষকের গবেষণা কর্মের উৎসাহ যোগাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং লোকসংস্কৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অনেক আদিবাসী এবং অন্যান্য লোকধর্মীয় গোষ্ঠী বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে এদেশকে করেছে সমৃদ্ধ। এটি সর্বজনবিদিত যে, প্রতিটি সংস্কৃতি, ধর্ম এবং লোকধর্মের রয়েছে নিজস্ব ক্রিয়াকরণ এবং সাধন-ভজন পদ্ধতি। একথা অনস্বীকার্য যে, সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে আর্থ-সামাজিক জীবনধারা গতিশীল থাকে এবং তারা নানারকম বিশ্বাস, মুল্যবোধ ও আচার-বিশ্বাস পালনের মাধ্যমে এ ঐতিহ্য ধারণ করে আছে। উল্লেখ্য লোকধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীতে লিখিত গ্রন্থ-কেতাব খুব কমই মূল্যায়ণ করা হয়। ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বায় বিশ্বাসী বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ অথবা বাউল মতবাদ নিয়ে বিভিন্ন লেখক ও গবেষক নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণা করলেও মতুয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণার কথা জানা যায় না। এ কারণে জ্ঞানের অবরূদ্ধ দ্বার উম্মোচনে মতুয়া সম্প্রদায় এবং লোকধর্মের অনুষঙ্গ নিয়ে তাদের সামাজিক আন্দোলন বিষয়ক গবেষণা সময়ের দাবি।

আমরা জানি প্রত্যেক গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্য নতুন জ্ঞানের সন্ধান। 'লোকধর্ম ও মতুয়া সম্প্রদায় ঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা' শীর্ষক গবেষণা কর্ম সে লক্ষ্যেই নির্বাচন করা হয়। এই অতি অপরিচিত সংস্কৃতি কিভাবে এবং কি কারণে উৎপত্তি হলো এবং সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণি কেন ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামল সে বিষয়ে কৌতুহল জন্মানো অযৌক্তিক নয়। এটি বিবেচনায় নিয়ে বিচিত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত সমাজে লোকধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব, বিকাশ এবং অনিবার্য্যতা নিয়ে দেখা দিল কৌতুহল। এ সময় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অধিকারহীনতার যে প্রসঙ্গ আসে সেটি উদ্ভাবনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে মতুয়া লোকধর্মীয় সম্প্রদায় (sect) বা সমন্বয়বাদী চেতনা ঐক্যবদ্ধকরণে যারা অবদান রেখেছিল বিশেষ করে গৌতম বুদ্ধ (৫৬৩ খৃ. পূ.-৪৮৩ খৃ পূ.) শ্রী চৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩), অনু প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) এবং অনু অনু প্রবর্তক গুরুচ্চাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭) সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা জরুরী।[১]

কারণ তাদের অবদান বিশ্লেষণ থেকে জানা যাবে কোন ধরণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সন্ধানে অনিবার্যভাবে প্রচলিত বৈষম্যমূলক সামাজিক রীতিনীতি ভাঙতে মতুয়া সম্প্রদায় ভূমিকা পালন করে। সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে মনে হয়েছে তৎকালীন সময়ে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতি বর্ণ প্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে এক রক্তপাতহীন অথচ বিপ্লবী সংগ্রাম ঘটিয়েছিল মতুয়া সম্প্রদায়।[২] এ সময় তারা কোন ধরনের প্রতিবাদ করেছিল সেটি জানা ও বোঝার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বোঝা যায় এদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনের প্রেক্ষাপটে মতুয়াদের একটি সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের অবদান রয়েছে তা জানা দরকার। এ বিষয়টি সামনে রেখেই আলোচ্য গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়; বিশেষভাবে লোকসমাজ থেকে মতুয়া লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্মেষ, বিকাশ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এ সম্প্রদায় মানবতাবাদের পক্ষে এবং সাম্যবাদী চেতনায় বিশ্বাস করলেও তা আজও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে অজ্ঞাত। এ বিষয়টি জানার কৌতুহল থেকেও এ গবেষণাটি সম্পন্ন করার চিন্তা করা হয়। সুফি, বৈষ্ণব, বাউল, কর্তভজা, ব্রাহ্ম অথবা চার্বাক আন্দোলনের সাথে মতুয়া লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কের স্বরূপ কেমন সেটিও এ অঞ্চলের মানুষের এখনও অজানা। তাই সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ, বাউল মতবাদ, কর্তাভজা মতবাদ, ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং চার্বাক মতবাদ সম্পর্কে আরও জ্ঞানার্জন খুবই জরুরী। মূলতঃ সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবাদ জানাতে এ সকল লোকধর্মীয় সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করে।[৩] তবে এ সব সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর ন্যায় মতুয়া সম্প্রদায় সেভাবে ভূমিকা পালন করছে কিনা সেটি জানা প্রয়োজন। সামাজিক জীবনে শান্তি ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত করাই মতুয়া সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য কি না সে বিষয়টিও উপেক্ষা করা যাবে না। তাছাড়া উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও অনুশীলনের অভাবে সেটি বাঁধাগ্রস্থ হয়েছে কিনা তাও জানা দরকার। এসব নানা প্রসঙ্গে মতুয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক জানার চেষ্টা করা হয় বর্তমান গবেষণায়।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সৃষ্টির স্বীকৃত ও অনবদ্য উপায় হলো গবেষণা। এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক (systematic) কার্যক্রম যা বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন ও ফলাফল প্রদানে সক্ষম বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে Kerlinger (1964) এর মত হলো, æResearch is a systematic controlled, emperical and critical investigation of hypothetical, propositions about the presumed relations among natural phenomena.”[৪]

এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, যে সকল সমস্যা নিয়ে সমাজ গবেষণা হয়ে থাকে প্রধানত তা হয়ে থাকে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এ রকম একটি অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে উদ্ভূত প্রতিটি লোকধর্ম প্রচ্ছন্ন মানবতাবাদ ও সংস্কারমুক্ত চেতনা লালন করে। সুতরাং লোকধর্ম বা লোকায়ত ধর্ম হিসেবে মতুয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে জানা গুরচত্বপূর্ণ। একটি মানবতাবাদী আন্দোলন হিসেবে মতুয়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান কিরূপ হবে সে ব্যাপারেও জ্ঞান অর্জন জরচ্রী। এ সব নানা প্রশ্নের মাঝে চিহ্নিত করা হয় কয়েকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই গুলো নিম্নরূপ-

- মতুয়া সম্প্রদায়ের বিকাশে লোকধর্মের চেতনা কেন গুরচত্বপূর্ণ তা বিশ্লেষণ করা;
- লোকধর্ম এবং মতুয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ধারণা অর্জন করা এবং
- মতুয়া সম্প্রদায়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করা।

গবেষণা এলাকা

বাংলাদেশের বৃহত্তর ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, যশোর, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলা মতুয়া জনগোষ্ঠীর প্রধান আবাস স্থল। তবে বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা জেলা গবেষণা কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। বিশেষ করে খুলনার মতুয়া অধ্যুষিত ডুমুরিয়া, দাকোপ এবং বটিয়াঘাটা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ডুমুরিয়া উপজেলার মির্জাপুর মতুয়া সম্প্রদায়ের একক প্রাধান্য। তাই নিবিড় পর্যবেক্ষণের

জন্য নির্বাচন করা হয়েছে ডুমরিয়ার মির্জাপুর গ্রাম। কেননা গুণগত গবেষণায় ক্ষুদ্র পরিসরে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ অপিরহার্য্য। এক সময়ের নম:শূদ্র অধ্যুষিত এই দক্ষিণ অঞ্চল মতুয়া দর্শনের স্বরূপে প্রভাবান্বিত হয়ে তাদের আন্দোলন আজও অব্যাহত রেখেছে। শাস্ত্রীয় ধর্মের পরিচয়ে রাষ্ট্রে বসবাস করায় এদের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। একটি মানচিত্রের মাধ্যমে গবেষণা এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। চিত্রটি পরিশিষ্ট-৪ এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

গবেষণা সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক ধারণা

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় তাত্ত্বিক (theoretical) ধারণা প্রদান একটি গবেষণার অপরিহার্য্য অংশ। আমরা জানি বিভিন্ন লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে সমাজবিজ্ঞানের কেন না কোন তত্ত্বের একটি সম্পর্ক আছে। মতুয়া লোকধর্মীয় সম্প্রদায় বিশ্লেষণে মাঠ পর্যায়ের তথ্যের সাথে সাহিত্য আলোচনার সাদৃশ্য পরীক্ষা করা যেমন বাঞ্চণীয় তেমনি পৃথিবীর লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথেও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সম্পর্ক তৈরি করা জরুরী। এ প্রেক্ষিতে মতুয়া লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের গবেষণায় মার্কস, বেবার এবং ডুর্খেইমের তত্ত্বের সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় কার্লমার্কস ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার, ম্যাক্স বেবার সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার এবং এমিল ডুর্খেইম সামাজিক সংহতির প্রতীক (collective conscience) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তবে একটি ব্যাপারে সবাই একমত যে, ধর্ম একটি মোহ (illusion) সৃষ্টিকারী সাংস্কৃতিক উপাদান।[৫] তিনজন সমাজবিজ্ঞানীর তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিচার বিশ্লেষণ এবং মতুয়া সম্প্রদায় ও এর সাথে সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ, বাউলতত্ত্ব, কর্তাভজা সম্প্রদায়, ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং চার্বাক দর্শন বিশ্লেষণ করে আমি সুনির্দিষ্ট কয়েকটি গবেষণা প্রশ্ন তৈরী করেছি এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট নানারকম তথ্য ও উপাত্ত সৃষ্টি করেছি। তবে এ সময় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, পর্যবেক্ষণ এবং উত্তরদাতার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারকেও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক ধারণা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রত্যয়গত ধারণা

প্রত্যেক গবেষণায় গবেষণা সংশ্লিষ্ট কিছু প্রত্যয়গত বিষয় থাকে। গবেষণার বিষয়বস্তু বাস্তবমুখী করার প্রয়োজনে এগুলো সম্পর্কে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমান গবেষণাও এর ব্যতিক্রম নয়। এ লক্ষ্যে প্রস্তাবিত গবেষণায় গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়গত বিষয় যথা- ধর্ম, লোকধর্ম এবং মতুয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ধারণা প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

ag

বর্তমান গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হলো ধর্ম। সংস্কৃতির একটি উপাদান শাস্ত্রীয় ধর্ম, লোকধর্ম অথবা অন্য কোন উপ ধর্মীয় সম্প্রদায়। ধর্মের ইংরেজি প্রতিরূপ ‘Religion’ শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ‘Religio’ থেকে এসেছে। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধারণ করা। ‘ধৃ’ ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। সুতরাং বলা যায় মানসিক বৃত্তি সমূহের কর্ষণ অর্থাৎ যা মনের চেতনাকে ধারণ করে, সৃজনশীল করে এবং চেতানাকে সমৃদ্ধ করে সেটিই হল ধর্ম।[৬]

ধর্মের এই সাহিত্যকেন্দ্রিক ধারণাটিই সর্বসাধারণের মধ্যে বেশি পরিচিত। পক্ষে-বিপক্ষে অনেক আলোচনা সমালোচনা সত্ত্বেও ধর্ম সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণাই সামাজিক গবেষণায় স্বীকৃত। সামাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ধর্ম হলো সাংস্কৃতিক বিন্যাসের একটি রূপ। সমাজবিজ্ঞানী মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর মতে,

> ধর্ম নীতিগতভাবে বিদ্যমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিন্যাসকে সমর্থন যোগায়।...ধর্ম হচ্ছে অধিপতি শ্রেণির মতাদর্শের উৎপাদন। এটি একই সাথে সেই শ্রেণির আধিপত্যকে বৈধতা ও স্বভাবিকত্ব দান করে। পরজগতে মুক্তির আশা ভরসা প্রদানের মাধ্যমে ধর্ম ইহজগতের নিপীড়নকে মেনে নেওয়ার আহবান জানায়।[৭]

কার্ল মার্কস এবং তার সহযোগী বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ধর্মকে মায়া কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে যন্ত্রণা নিবারক হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম ধর্মকে এভাবে দেখতে নারাজ। তিনি মনে করেন ধর্ম সমাজ হতেই সৃষ্ট এবং এর মাধ্যমে সামাজিক সংহতি নিরূপিত হয়। তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমাজের রূপক হিসেবে দেখতে চান।[৮] এ ধরণের সংজ্ঞার মাধ্যমে বোঝা যায় সমাজকাঠামো যে ধরনের আচার বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আদর্শ, পবিত্রতা, অপবিত্রতা, ধারণ করে আছে সেটাই হলো মানুষের ধর্ম। এমন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স বেবার। তাঁর মতে, অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস সার্বজনীন। এই শক্তি প্রাপ্ত বস্তু ও সত্তায় বিশেষ গুণ বিদ্যমান। ধর্মের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিরা সাধারণত এ রূপ গুণের অধিকারী হয়।[৯] উপরিউক্ত সংজ্ঞা সমূহের আলোকে বোঝা যায় সমাজ জীবনের কোন কিছুই ধর্মের বাইরে নয়। জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি উপাদানই ধর্মের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এর অর্থ পোষাক, পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, গান, বাজনা, বিশ্বাস, অবিশ্বাস সবই ধর্মের অন্তর্ভূক্ত। ধর্ম শিক্ষিত লোকের জীবনাচরণ আর লোকধর্ম নিরক্ষর ও অল্পশিক্ষিত লোকের যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি।[১০] সুতরাং বলা যায় সমাজ জীবনে ধর্মের পরিপূর্ণ চিত্র গ্রহণে লোকধর্মের উপাদানও সমভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

†j\Kag

বাংলাদেশের লোকধর্ম নানা উপাদানে সমৃদ্ধ। এদেশের মানুষের মূল চেতনা বাঙালি সংস্কৃতি। লোকধর্ম এর অনুষঙ্গ। এটি হাজার বছর ধরে বাংলাদেশে চর্চা হয়ে আসছে।[১১] লোকধর্ম আচারিত বিশ্বাস, প্রথা, মানা (Mana), ট্যাবু (Taboo) ইত্যাদি বিষয় সমূহ বাঙালির যাপিত জীবনের সাথে জড়িত। এছাড়া এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় ছড়া, পুঁথি, নৃত্য, লোকগীতি, তন্ত্র, মন্ত্র, চারু-কারু, লোকাচার, প্রহেলিকা, জারি, সারি, মুর্শিদী, মার্সিয়া, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, কবিগান, ঘেটুগান, ঝুমুর, যাত্রা, গজল, কীর্তন, আলপনা, অন্নপ্রাসন, বস্ত্রালঙ্কার এবং বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাঙালি সমাজ তাঁর সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।[১২] মানুষের জীবনে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারের প্রতিটি উপাদানই বাঙালি জীবনের অঙ্গ। মানব জীবনের প্রথা বিরোধী আচার-আচরণ নানাভাবে লোকধর্মের অন্তর্ভুক্ত। শাস্ত্রীয় ধর্মের বাইরে সামাজিক বৈষম্যের বিপরীতে সৃষ্টি হয়েছে অনেক লোকধর্মীয় (sect) সম্প্রদায় এবং এর উপর ভিত্তি করেই তৈরী হয়েছে নানা রকম পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা। এগুলোও মূল ধর্মের ন্যায় সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেছে। সুফি, বৈষ্ণব, বাউল, কর্তভজা, ব্রাহ্ম, চার্বাক-এর আচার বিশ্বাসও লোকধর্মের উপদান হিসেবে গণ্য। এ প্রসঙ্গে অনুপম হীরা মণ্ডলের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "শাস্ত্রীয় ধর্মের কাছাকাছি, পাশাপাশি বা মধ্যে চর্চিত, সর্বজনীন আবাহন সম্বলিত, কঠোর কঠিন রীতি বিরুদ্ধ, লোকসমাজের দ্বারা আচরিত, ইহজাগতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ধর্মকে লোকধর্ম বলা যায়।"[১৩]

সুতরাং বলা যায় ধর্মীয় বিশ্বাসকে ঘিরে মানুষের মধ্যে যে মূল্যবোধ, আদর্শ এবং ধারণা নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত লোকের মধ্যে বিকশিত হয় সেটিই লোকধর্ম। সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, হাসি, কান্না, বিশ্বাস, মুল্যবোধ ধর্মীয় বিধি-নিষেধ (taboo) লোকধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি প্রাকৃতিকভাবে প্রাণবন্ত বিশ্বাস, মুল্যবোধ এবং আদর্শের বিকাশ ঘটায়।[১৪]

বাংলাদেশের লোকধর্মে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, সুফি, বৈষ্ণব, বাউল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং উপ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপস্থিতি রয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতির সাথে এরা সব সময় মিলেমিশে থাকতে চেয়েছে, কখনও সেটি পেরেছে, আবার কখনও পারেনি। এ কারণে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাস্তবায়ন সেখানে বার বার হোঁচট খেয়েছে। এই ব্যর্থতার প্রতিবাদে ভারতবর্ষে অনেক লোকধর্মীয় সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে; গড়ে তোলে সামাজিক আন্দোলন। এদেরই একটির নাম মতুয়া সম্প্রদায় বা মতুয়া আন্দোলন।

gZqv m¤c‘vq

মতুয়া সম্প্রদায় বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির এক বিশেষ অংশ। বাংলাদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতিতে বসবাসরত নানা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মত মতুয়া সম্প্রদায়ও একটি অন্যতম লোকধর্মীয় সম্প্রদায় (sect)। হিন্দু-মুসলমান উভয় মূল্যবোধের সমন্বয়ের কারণে মতুয়া সম্প্রদায়কে কখনও কখনও বাউল মতবাদের (school) একটি শাখা ভাবা হয়েছে। কোন কোন লেখক ও গবেষকের দৃষ্টিতে মতুয়ারাই আদি বাউল এবং তাদের থেকে নানা বৈশিষ্ট্যের বাউল সৃষ্টি হয়েছে।[১৫] এ সম্প্রদায়ের মুল বসতি অঞ্চল বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি। ধর্মে সনাতন, আদর্শে বৈষ্ণব, বাউল অথবা সুফি যাই বলা হোক না কেন মতুয়া নামে তারা বাংলাদেশ ও ভারতসহ সমগ্র পৃথিবীতে বসবাস করছে। মতুয়ারা মনে করে যিনি সব কিছুর মূলে তার ভজন সাধনই হলো আসল কাজ। দেহকে তারা ঈশ্বরের সম্পত্তি গণ্য করে খাজনা দেয়। মতুয়ারা মনে করে অন্যের সম্পত্তিতে বিনা খরচায় বসবাস করা অনুচিত। সুতরাং তারা কর্তার প্রদত্ত আবাসে বসবাসের জন্য বার্ষিক ও মাসিক বৃত্তি প্রদান করে যা খাজনা হিসেবে গণ্য।[১৬] তবে মতুয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির প্রেক্ষাপটে দেখা যায় মূলত জমিদার-নীলকরদের শোষণ এবং ব্রাহ্মণসৃষ্ট বর্ণবৈষম্যই মতুয়া ক্ষুদ্র প্রতিবাদী লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভবের মূল কারণ।[১৭] এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় এটি একটি প্রতিবাদী চেতনা। এ প্রসঙ্গে ঠাকুর (২০১০) এর বক্তব্য প্রনিধান যোগ্য। তাঁর মতে, প্রতিকূল ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে, ধর্মীয় কুসংস্কার, বর্ণভেদ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, কৌলিন্য প্রথা, জমিদার, নীলকরদের শোষণ, ইংরেজ আগ্রাসন প্রভৃতির বিরূদ্ধে প্রতিবাদী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ মতুয়া লোকধর্মীয় সম্প্রদায় (sect) আবির্ভূত হয়।[১৮]

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

একথা স্মর্তব্য যে, বর্তমান গবেষণায় আমি অনেক রকম গাল গল্পের মুখোমুখী হয়েছি। মতুয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির প্রেক্ষাপট বলতে গিয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরের (১৮৪৭-১৯৩৭) সি.এস.মিডের অস্ট্রেলিয়ার বাড়ি দেখানোর কাহিনী যেমন পেয়েছি তেমনি জেনেছি হরিচাঁদ ঠাকুরের (১৮১২-১৮৭৮) বাস্ত ভিটা থেকে উচ্ছেদ হওয়ার কাহিনী। এসব কারণে গবেষণার মূল বিষয়বস্তু অনেক সময় রহস্যাবৃত থাকার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া গবেষণা ক্ষেত্রে দেখেছি অনেক উত্তরদাতা গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানে অনীহা প্রকাশ করেছেন। এর মূল কারণ হিসেবে আমার

কাছে মনে হয়েছে এখানে গবেষণা সম্পর্কে এক ধরণের নেতিবাচক ধারণা এবং নিজ গোত্র বা সম্প্রদায় সম্পর্কে নানা রকম দূর্বলতার দিক লুকানোর অপপ্রয়াস। এ কারণে অনেকে নানারকম কৌশল অবলম্বন করে গবেষণা প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান থেকে বিরত থেকেছেন। এ ধরনের চিন্তাভাবনা গবেষণা কাজে যথেষ্ট বাঁধার সৃষ্টি করেছে। ফলে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের বৈধতা ও নির্ভরযোগ্যতা (validity & reliability) নিরূপণে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে; সময়ও নষ্ট করতে হয়েছে অনেক। এছাড়া সুনির্দিষ্ট সময়ে কাজটি শেষ করার তাগিদ অনুভব করায় অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গবেষণা কাজে অনেক রকম সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য গবেষণা চলাকালে অনেক নতুন নতুন তথ্য ও উপাত্তের সান্নিধ্যে আসলেও প্রকৃতপক্ষে সেটি বর্তমান গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। একারণে গবেষণালব্ধ ফলাফল যথাযথভাবে বিশ্লেষণের ত্রুটি পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়া যায় না। ঐতিহাসিক পর্যালোচনা এবং গবেষণা ক্ষেত্রের তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মনে হয়েছে প্রধানত ব্রাহ্মণ্যবাদের বৈষম্যের প্রতিবাদ জানাতে মতুয়া আন্দোলন সংগঠিত হয়। সমাজ সংস্কারক হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৯৩৭) ছিলেন এ আন্দোলনের নেতা। কিন্তু এখানেও এক শ্রেণির নব্য ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হয় যারা এ সম্প্রদায়কে নানা রকম কল্পকাহিনীতে নিয়ে গেছেন এবং নব্য শোষক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ ধরনের জটিলতার পাশাপাশি গবেষণার জন্য নির্ধারিত সব বিষয়ে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এছাড়া গবেষণার সময় আমি আরও দেখেছি বিপ্লবী এ লোকধর্মের বেশির ভাগ সদস্য শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আধুনিকতা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই বললেই চলে। এরকম নানাবিধ সীমাবদ্ধতা গবেষণা কর্মে কিছুটা হলেও স্থবিরতা এনে দিয়েছে। এসব বিষয়ে ভবিষ্যতে যারা গবেষণা করবেন তাদের জন্য আমার পরামর্শ হলো মতুয়া সম্প্রদায়ের উপর বর্তমান গবেষণাটি এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নানাভাবে সাহায্য করবে। যেহেতু আমার গবেষণাটি পুরোপুরি মৌলিক এবং অতি অপরিচিত মতুয়া সম্প্রদায়কে নিয়ে আবর্তিত সেহেতু তথ্য সংগ্রহে অনেক সময় ক্ষেপণের প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া বর্তমানে যে সব তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি সেটিও বেশ সময় নিয়ে ধৈর্য্য সহকারে বৈধতা এবং নির্ভরযোগ্যতা (validity & reliability) যাচাই করতে হয়েছে। উপরন্তু প্রাপ্ত তথ্য ভাবগতভাবে (thematically) উপস্থাপনের জন্য সময় বেশি লেগেছে। গবেষণা প্রশ্নের উত্তর প্রদানে উত্তরদাতাদের অনীহা, অপর্যাপ্ত বই পুস্তক এবং পর্যাপ্ত অধুনা (updated) উপাত্তের অভাবে বর্তমান গবেষণায় আমি অনেক রকম সমস্যায় পড়েছি। এতদসত্ত্বেও বুঝেছি একমাত্র ব্রাহ্মণ্যবাদই এ উপমহাদেশে লোকধর্ম বা উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় (sect) উদ্ভবের মূল কারণ। এটি ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরও উৎস। সে যাই হোক এ জাতীয় ব্যর্থতা আরেকটি উপ-ধর্মীয় বা লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করেছে। মতুয়া লোকধর্মীয় সম্প্রদায় (sect) আত্মপ্রকাশের মূল কারণও সেটি। দূর্বল নেতৃত্ব, সাংগঠনিক দূর্বলতা এবং প্রচারক হিসেবে উপযুক্ত মুখপাত্রের অভাব (গুরুচাঁদের অনুপস্থিতিতে) মতুয়া সম্প্রদায় বিকাশের পথে অনেক রকম বাঁধার সৃষ্টি হয়েছে বলে গবেষণায় ধারণা করেছি। এই কারণে মতুয়া সম্প্রদায় এবং অন্যান্য লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের চেতনা ধীরে ধীরে ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছে এবং আদর্শ যাচ্ছে হারিয়ে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব রয়েছে। এটি লোকধর্মীয় চেতনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এইরূপ পরিস্থিতিতে এ সম্প্রদায়ের অন্যান্য নানাদিক যেমন-মতুয়া সঙ্গীত, তাদের শিক্ষা, তাদের ভেষজ চিকিৎসাগ্রহণের প্রবণতা এবং তাদের সাধন ভজন পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার জন্য ভবিষ্যৎ গবেষকদের প্রতি থাকলো বিশেষ পরামর্শ। পরবর্তী অধ্যায়ে আমি বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। কেননা পদ্ধতি ছাড়া কোনো গবেষণারই সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়।

তথ্যপঞ্জি

১. আবদুল ওয়াহার, jvjb-nvmb: Rxeb-Kg-mgvR, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৯, পৃ.১৪।

২. পাগল চাঁদ ঠাকুর, KZvfRv m¤cÖ'vq I mZ¨ 'kb, যশোর, মিলনতীর্থ, ২০১০, পৃ. ১৬৪।

৩. রামদুলাল রায়, ev0vjxi 'kb : cvPxbKvj †_‡K mv¤cÖZK Kvj, ঢাকা, উপমা প্রকাশন, ২০১১, পৃ. ২০২।

৪. Fred N. Kerlinger, *Foundation of the Behavioral Research*, New Yark, Halt, Rinhart & Winston, 1964 p.11.

৫. Ian Robertson, *Sociology*, New York, Worth, 1980, p. 373.

৬. মোহাম্মাদ সোলায়মান, cm½ ms¯wZ, ঢাকা, অ্যাডার্ণ পাবলিকেশন, ২০০৩, পৃ. ১৬

৭. উদ্ধৃতিঃ অনপম হীরা মণ্ডল, evsjv‡'‡ki †jvKag 'kb I mgvRZË,ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ.১৭।

৮. উদ্ধৃতিঃ অনপম হীরা মণ্ডল, evsjv‡'‡ki †jvKag 'kb I mgvRZË,ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ.১৮-১৯।

৯. উদ্ধৃতিঃ অনপম হীরা মণ্ডল, evsjv‡'‡ki †jvKag 'kb I mgvRZË,ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ.১৯।

১০. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, ms¯wZ K_v, ঢাকা, বুকস ফেয়ার, ২০১২, পৃ.১।

১১. মুহাম্মদ এনামুল হক, e‡½¯dx cfve, ঢাকা, র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ২৪।

১২. আহমদ শরীফ, evDj ZË, ঢাকা, পড়ুয়া, ২০০৩, পৃ. ৪১।

১৩. অনপম হীরা মণ্ডল, evsjv‡'‡ki †jvKag 'kb I mgvRZË,ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ.৩০।

১৪. বিশ্বনাথ ঘোষ, সম্পাদিত, বিশ্বাকোষ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৮৯।।

১৫. সুধীর চক্রবর্তী, Mfxi wbRb c‡_, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫, পৃ. ১১।

১৬. অক্ষয় কুমার দত্ত, 'কর্ত্তাভজা', শামসুজ্জামান খান (সম), evsjv GKv‡Wgx cwÎKv, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৯, পৃ. ৪৩৬।

১৭. ওয়াকিল আহমেদ, †jŠwKK Ávb †KvI, ঢাকা, গতিধারা, ২০১১, পৃ. ৪৩২।

১৮. পাগল চাঁদ ঠাকুর, KZvfRv m¤cÖ'vq I mZ¨ 'kb, যশোর, মিলনতীর্থ, ২০১০ পৃ. ৬১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়ে আমি গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা, লক্ষ ও উদ্দেশ্য, গবেষণা এলাকা, গবেষণা সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক ধারণা, প্রত্যয়গত ধারণা (ধর্ম, লোকধর্ম, মতুয়া সম্প্রদায়) এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা বিষয়ে আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ে আমি আলোচনা করব গবেষণায় উপাত্ত গঠন ও বিশ্লেষণে যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করেছি তার উপর।

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে মূলত গুণবাচক (qualitative) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সামগ্রীক বিবেচনায় গবেষণার বিষয়বস্তু, গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্য, তথ্যের প্রকৃতি এবং তথ্য প্রদানকারীদের সামাজিক পটভূমি ইত্যাদি গুণবাচক (qualitative) গবেষণা পদ্ধতির উপযোগী বলেই এ গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে গুণবাচক (qualitative) গবেষণা পদ্ধতি। উপাত্ত গঠনে (generation) In-depth semi-structured interview বা আধা কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে তথ্য বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যাখ্যামূলক (interpretive) দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।[১] উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিবেচনার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করা হয়েছে।[২] উপাত্ত সংগ্রহের প্রাথমিক পর্যায়ে মতুয়া সম্প্রদায়ের উপর লিখিত বই এবং প্রবন্ধকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, বিশেষ করে যেখানে মতুয়া সম্প্রদায় এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য লোকসম্প্রদায় তথা সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ, বাউলতত্ত্ব, ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং চার্বাক দর্শন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাওয়া গিয়েছে। নমুনা চয়নের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক নমুনায়ন (theoretical sampling) পদ্ধতি প্রয়োগ করে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী (interviewee) নির্বাচন করা হয়েছে। তথ্য সংগঠিত (organize) করার ক্ষেত্রে ভাব (theme) কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং উপাত্ত সাজানো হয়েছে ভাবগতভাবে (thematically)। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাব (theme) এর মাধ্যমে কোডিং (coding) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই এর জন্য মতুয়া সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ পান্ডিত্য রয়েছে এমন ব্যক্তিদের সাথে উপাত্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা সামাজিক গবেষণায় Respondont Validity Method নামে পরিচিত।[৩] এখানে গবেষণার একক (population) মতুয়া সম্প্রদায়।

২.১ নমুনায়ন এবং উপাত্ত গঠন পদ্ধতি (data generation technique)

বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে যেহেতু গুণবাচক (qualitative) পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে সেহেতু তাত্ত্বিক নমুনায়ন (theoretical sampling) পদ্ধতি এখানে যুক্তিযুক্ত। তাত্ত্বিক নমুনায়ন হলো প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বসমূহের উন্নয়নে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান। গবেষণা যখন তত্ত্ব ও ধারণা বিকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তখনই এ পদ্ধতিটির সর্বোত্তম ব্যবহার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গবেষণার মূল লক্ষ্যই থাকে তত্ত্ব ও ধারণার উন্নয়ন করা যেগুলো প্রতিষ্ঠিত কিংবা বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী ও পদ্ধতি থেকে উদ্ভুত। উল্লেখ্য বর্তমান গবেষণায় উপাত্ত গঠনে যে দুটি পদ্ধতি (technique) ব্যবহার হয়েছে তার প্রথমটি হলো প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। প্রথমেই এর প্রত্যয়গত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

যে পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরে কোন সমাজ অথবা সামাজিক সমস্যা গভীর সমীক্ষায় মনোনিবেশ করা হয় তাকে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে একজন গবেষককে গবেষণা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন অবস্থান করে গবেষণাধীন সমাজ বা জনগোষ্ঠীর সঠিক চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করতে হয়। এ সময় গবেষণা এলাকার মানুষের

ভাষা, তাদের জীবন ধারণ পদ্ধতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়। সর্বোপরি গবেষককে গবেষণাধীন এলাকায় অতি আপন জনে পরিণত হতে হয়।[৪] গুণবাচক গবেষণায় এ পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম।

উপাত্ত গঠন ও গবেষণা প্রশ্নের উত্তর জানতে আধাকাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার (in-depth semi structured interview) পদ্ধতি যেহেতু গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেহেতু আমি গুরচত্ব উপলব্ধি করে ২০ জন উত্তরদাতা নির্বাচন করেছি। এ উত্তরদাতা নির্বাচনে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি (purposive sampling) প্রয়োগ করা হয়েছে। মতুয়া সম্প্রদায় একটি অনগ্রসর ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠি হওয়ায় এ সম্প্রদায় সম্পর্কে তাদের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এমতাবস্থায় মতুয়া সম্প্রদায় এবং এর বাইরে থেকে এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এমন ২০জন উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ গবেষণাটি গুণবাচক (qualitative) পদ্ধতিতে সম্পাদন করার জন্য বিষয় বিশেষজ্ঞ (expert) নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ।

২.১.১ প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ

ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা নিয়ে গবেষণায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মতুয়া সম্প্রদায় যেহেতু ক্ষুদ্র ধর্মীয় সম্প্রদায় (sect) এবং নানা রকম প্রথা, আচার, বিশ্বাস লালন (cult) করে সেহেতু প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ (participant observation) বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত Goffman (1961) এর বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য। তাঁর মতে,

> It is my belief that any group of persons, primitives, pilots or patients, develop a life of their own that becomes meaniugful, reasonable and normal once you get close to it. [৫]

তাঁর বক্তব্যে বোঝা যায় কোন উপজাতি, উপগোষ্ঠী অথবা লোক সম্প্রদায় সম্পর্কে জানার জন্য প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ (participant observation) পদ্ধতির মাধ্যমে খুব কাছাকাছি আসা যায় এবং এটি খুবই অর্থপূর্ণ ও যৌক্তিক কাজ দেয়। সুতরাং এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মতুয়া লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের জীবনাচার এবং সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব-অনুষ্ঠান গুলোতে উপস্থিত থেকে সেগুলোতে অনুষ্ঠিত আচার-আচরণ-ক্রিয়া কৃত্য পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, জ্ঞাতি সম্পর্ক, সরকার ব্যবস্থা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কৌশলসহ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনধারা সম্বলিত আচার, সামাজিক সংহতির ভিত্তি, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি বিষয় পর্যবেক্ষণের আওতায় আনার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় মতুয়াদের ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী চেতনা কতটা প্রবল এবং সেখানে কোন ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে কিনা সে সব বিষয়ে। এছাড়া সমাজ কাঠামোয় মতুয়া সম্প্রদায় গানের মাধ্যমে, খাদ্যাভ্যাস চর্চার মাধ্যমে, জ্ঞাতি সম্পর্ক সম্বোধনে কোন রকম বিজ্ঞান মনস্ক ও নিরপেক্ষ চেতনা লালন করছে কিনা সেগুলোও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে। সার্বিকভাবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে গবেষণা প্রশ্নগুলোকে মাথায় রেখে তথ্য গঠন করার চেষ্ট করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য ২০১৪ সালের মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ধার্য্যকৃত সময়ের মধ্যে চারদফা আমি এ ধরণের পদ্ধতি ব্যবহার করি। উপাত্ত সংগ্রহের সময় আমি মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কিছু ছবি উঠাই এবং গুরচত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় অন্যান্য সূত্র থেকেও কিছু ছবি সংগ্রহ করি (এ সম্পর্কে দেখুন পরিশিষ্ট-৩)।

২.১.২ সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং সাক্ষাৎকার প্রশ্ন

গুণবাচক গবেষণা (qualitative research) গুণবাচক প্রপঞ্চ নিয়ে আলোকপাত করে। গুণবাচক (qualitative) গবেষণায় পরিমাপন, প্রমিতকরণ ও গাণিতিক কৌশলাদির ব্যবহার ন্যূনতম। এই গবেষণার উপাত্ত এমনভাবে সংগৃহীত হয়ে থাকে যে, তা সংগ্রহের সাথে সাথে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অনেকখানি অর্থপূর্ণভাবে ব্যক্ত হতে শুরু করে। আর এভাবে গুণাত্মক বিশ্লেষণতা উপাত্তের ক্ষেত্রে ভূমিতে নিয়ে যায় সবাইকে। এই প্রসঙ্গে Kothari (1988) এর মত হলো, æQualitative research is conceerned with qualitative phenomena.i.e. to or inter relating quality orlind”.[৬] বর্তমান গবেষণায় সে বিষয়টি মাথায় রেখেই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে Kothari’র বক্তব্য প্রাধান্য দিলে আধা কাঠামো সাক্ষাৎকার (semi-structured) গুণাত্মক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে বলেই আমি মনে করি।

এক্ষেত্রে ২০ জন উত্তরদাতাকে নমুনার একক হিসেবে গ্রহণ করে গবেষণা উপযোগী তথ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এই উত্তরদাতাদের এক অংশ নির্বাচন করা হয়েছে সাধারণ মতুয়া সম্প্রদায় থেকে এবং অপর অংশ নির্বাচন করা হয়েছে যারা এ বিষয়ে জ্ঞান রাখে এমন ব্যক্তিদের থেকে। সাক্ষাৎকার গ্রহণে ‘Theory Saturation Point’ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি করা হয়েছে গবেষণা প্রশ্নের আকাঙ্খা পরিপূরণে।[৭] গবেষণায় তথ্য সৃষ্টি এবং তথ্য পাওয়ার জন্য যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাদেরকে ছদ্মনামে পরিশিষ্ট-১ এ উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তরদাতাগণের প্রতি সম্মান দেখিয়ে পরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে আমি তাদের ছদ্মনাম ব্যবহার করেছি। তাছাড়া গবেষণাটির সাথে স্পর্শ কাতর বিষয় হিসেবে ধর্মের সংশ্লিষ্টতা থাকায় বাড়তি সতকর্তার প্রয়োজন পড়ে।

গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার পরিচালনা এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক রকম নির্দেশনা থাকে যা নিম্নরূপ ঃ

- গবেষককে মনোযোগী শ্রোতা হতে হয়।
- উপযুক্তভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করতে হয়।
- সংবেদনশীল প্রশ্ন পরিহার করতে হয়।
- উত্তরদাতার উত্তর শোনা এবং প্রশ্ন বলার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়।
- আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা অপেক্ষা অনানুষ্ঠানিক গতিবিধি ও ভাষাগত লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করতে হয়।[৮]

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সব বিষয়গুলোই গবেষক হিসেবে আমি বিশেষ গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করেছি। উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য প্রশ্ন করার সময় অবলম্বন করেছি নানারকম কৌশল। বড় প্রশ্ন এবং সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করে ক্রমান্বয়ে মূল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। উত্তরদাতার উত্তর যাতে গবেষণা উপযোগী হয় সেজন্য Semi structured format, Structured format এবং বিভিন্ন রকম নোটও (jotting) ব্যবহার করেছি। তথ্য রেকর্ড করার জন্য উত্তরদাতাগণের অনুমতিক্রমে Digital Voice Recorder ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষাৎকার প্রশ্নগুলোর মধ্যে কিছু নমুনা প্রশ্ন পরিশিষ্ট-২ এ প্রদান করা হয়েছে।

২.২ উপাত্ত সংগঠন ও বিশ্লেষণ (data organise & analysis)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং তথ্য বিশ্লেষণের পরে প্রাপ্ত তথ্য গবেষণাপত্রের যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উপাত্ত বোঝা হয়েছে আক্ষরিকভাবে এবং ব্যাখ্যামূলকভাবে। এছাড়া গবেষণা কর্মে উপাত্তের প্রতিফলন হচ্ছে কিনা সে বিষয়টির প্রতিও খেয়াল করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন বর্তমান গবেষণায় তথ্য সাজানো এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে ভাবগতভাবে (thematically) যা মূলতঃ আমার গবেষণা প্রশ্নের প্রতিফলন (reflect) ঘটাতে পারে। এ সময় লক্ষ্য করা হয়েছে গবেষণার প্রত্যয়গত কাঠামো এবং গবেষণা প্রশ্নের যথাযথ ব্যবহারের প্রতি। বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য লোকধর্মের চেতনায় মতুয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক আন্দোলন বিশ্লেষণ। এ কারণে তথ্য উপস্থাপনের সময় লোকধর্ম, মতুয়া সম্প্রদায় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সুফি, বাউল, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, চার্বাক আন্দোলন সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যও যথাযথভাবে তুলনা করেছি। প্রায়োগিক প্রয়োজনে সরাসরি অথবা ভাবগত বক্তব্যও উপস্থাপন করা হয়েছে মাঝে মাঝে।

২.৩ বৈধতা এবং নির্ভরযোগ্যতা (validity & reliability)

উপাত্ত সৃষ্টির বৈধতা এবং ব্যাখ্যার নির্ভরযোগ্যতা উভয়ই প্রথমিকভাবে বৈধতা বা Validity-এর অন্তর্ভুক্ত। পরিমাপকের মানের ক্ষেত্রে দৃষ্ট পার্থক্য কি মাত্রায় বা পরিমানে গবেষণাধীন বিষয়ে প্রকৃতি ও পার্থক্যের প্রতিফলন ঘটায় সেই মাত্রা বা পরিমাণকে পরিমাপকের বৈধতা বলে। অন্যদিকে পরিমাপকের নির্ভরশীলতাকে (dependability) নির্ভরযোগ্যতা (reliability) বলে।[৯] উল্লেখিত গবেষণা প্রশ্নের আলোকে প্রাপ্ত তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রস্তাবিত গবেষণা পদ্ধতির সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা সেটি বৈধতা ও নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে খেয়াল করা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়।

বর্তমান গবেষণায় উপাত্ত সৃষ্টিতে দুই ধরণের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই দুটি পদ্ধতিই গবেষণা প্রশ্নের সাথে যথাযথভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং একথা বলা যায় যে, প্রাপ্ত তথ্য, প্রামাণ্য উপাত্ত ও গবেষণা প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি এটিও ঠিক যে, একই গবেষণা প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন ব্যক্তির উত্তর সঠিকভাবে গবেষণা সংশ্লিষ্ট হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এভাবে দ্বিমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণা প্রশ্নগুলো বহুমাত্রিকভাবে যাচাই করা হয়েছে বিভিন্নভাবে।

উপাত্ত বিশ্লেষণের গ্রহণযোগ্যতার কথা বিবেচনা করে, ‘quality and rigor’ দৃষ্টিভঙ্গিতে যত্নশীল এবং স্বচ্ছ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।[১০] যেহেতু উত্তরদাতাদের বেশিরভাগই যোগ্যতা সম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ সেহেতু উত্তরদাতার উত্তরকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে খুব বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

২.৪ নৈতিকতার প্রশ্ন (ethical issues)

যে কোন গবেষণা কাজে নৈতিকতার প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী। বিশেষত গুণবাচক (qualitative) গবেষণায় এটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিকাতার প্রশ্নে বর্তমান গবেষণায় যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রদর্শিত প্রধান প্রধান নৈতিক দিক গুলো হলো ঃ

- গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতা এবং ব্যক্তিবর্গের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলোকে গবেষণার বাইরে রাখা হয়েছে এবং গোপন রাখা হয়েছে তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়। উত্তরদাতাদের সম্মতি সাপেক্ষে তাদের প্রদত্ত তথ্য গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক উত্তরদাতা তাদের বক্তব্য অবিকলভাবে উদ্ধৃত করতে নিষেধ করায় তাদের সে সব কথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাহায্যে বুঝানো হয়েছে।
- আমি যাদের কাছ থেকে গবেষণা কাজে নানাবিধ তথ্য ও উপাত্ত পেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছি তাদের প্রতি যথাস্থানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি। গবেষণাক্ষেত্রে কেউ যাতে কোন কষ্ট না পায় সে ব্যাপারে সব সময় সতর্ক থেকেছি।

২.৫ গবেষণা অভিসন্দর্ভের কর্ম পরিকল্পনা

গবেষণাটি বাংলাদেশের খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার মির্জাপুর গ্রামে পরিচালনা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপাত্ত সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচী চলমান ছিল। তবে গবেষণা এলাকায় উপাত্ত সংগ্রহের সময় এখানকার উত্তরদাতাদের পরামর্শে এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানার জন্য খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা, লবণচোরা এবং যশোরের মনিরামপুর উপজেলার কুলটিয়া ও সাতক্ষীরার শিমুলবাড়িয়ায় ব্যাপক অনুসন্ধানী গবেষণা করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে সূচনা সভার আয়োজন করা হয়। সূচনা সভাগুলোতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদেরকে উপস্থিত করে গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা চাওয়া হয়। উপাত্ত সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হলে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে আরও কতিপয় সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

ক. ঐতিহাসিক পদ্ধতি : ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রত্যয় সমূহের উৎপত্তি, বিকাশ ও আন্তসম্পর্ক অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিতে মানবাধিকার বাস্তবায়নে মতুয়া সম্প্রদায়ের ভূমিকা অনুধাবনে কয়েকটি লোকধর্মের উপর অধ্যায়ন করা হয়েছে।

খ. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি : 'লোকধর্ম ও মতুয়া সম্প্রদায়' সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এমন ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ. সামাজিক জরীপ পদ্ধতি : লোকধর্মের চেতনায় মতুয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের মূল তথ্য উদঘাটনে সামাজিক জরীপের আওতায় গবেষণা প্রশ্নমালাও ব্যবহার করা হয়। এর ফলে গবেষণাটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট চিত্র পেতে সহজ হয়। প্রশ্নমালাটি পরিশিষ্ট-৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২.৬ গবেষণা এলাকার তথ্য সংগ্রহের সংখ্যা, নমুনা ও সময়কাল

বাংলাদেশের বৃহত্তর ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, যশোর, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলা মতুয়া জনগোষ্ঠীর প্রধান আবাস স্থল। তবে বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা জেলা এবং

এর আশপাশ গবেষণা কার্যক্রমের জন্য পরিধিভুক্ত হয়। বিশেষ করে খুলনার মতুয়া অধ্যুষিত ডুমুরিয়া, দাকোপ এবং বটিয়াঘাটা এখানে প্রাধান্য পায়। ডুমুরিয়া উপজেলার মির্জাপুর গ্রামটি নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হলেও গবেষণা এলাকায় যাওয়ার পরে তাদেরই পরামর্শে বিস্তৃত অঞ্চলে যেতে হয়। এটি করা হয় গুণগত গবেষণায় ক্ষুদ্র পরিসরে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে। এক সময়ের নম:শূদ্র অধ্যুষিত এই দক্ষিণ অঞ্চল মতুয়া দর্শনের স্বরূপে প্রভাবান্বিত হয়ে তাদের আন্দোলন আজও অব্যাহত রেখেছে। শাস্ত্রীয় ধর্মের পরিচয়ে রাষ্ট্রে বসবাস করায় উক্তরদাতাগণের সাথে কথা বলার পরেও এদের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তাছাড়া গবেষণার বিষয়বস্তু ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় উত্তরদাতা কর্তৃক তথ্য গোপনের প্রবণতাও লক্ষ করি। পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে মতুয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির প্রেক্ষপট। বর্তমান গবেষণাকে কার্যকরী রূপদান প্রয়াসের অংশ হিসেবে এটি অপরিহার্য্য। তবে তার আগে গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশিত ফলাফল প্রাপ্তির বিষয়টিকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে ২০ মাস সময় ধরে কর্ম-পরিকল্পনা ও সময়সূচির বিন্যাস সংক্রান্ত একটি সারণি উপস্থাপন করা হল (প্রতিটি ঘরকে ২ মাস হিসেবে গণনা করা হয়)ঃ

কর্মসূচি	২	৪	৬	৮	১০	১২	১৪	১৬	১৮	২০
মাঠ পর্যবেক্ষণ ও নির্বাচন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, জনবল নিয়োগ, কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ										
প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় তথ্য পত্রাদি (প্রশ্নপত্র, চেকলিষ্ট, প্রশিক্ষণ মডিউল প্রভৃতি) চূড়ান্তকরণ										
গবেষণা সহকারীদের প্রশিক্ষণ										
তথ্য সংগ্রহ কর্মসূচী সম্পাদন										
তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, যাচাই-বাছাই, বিন্যাস এবং বিশ্লেষণ										
চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন										

তথ্যপঞ্জি

১. Jenifer Mason, *Qualitative Researching*, London, Sage, 1995, P.149,

২. Zia Rahman, *Urban Policy in Bangladesh: The State, Inequality and Housing Crises in Dhaka City*, Alberta, Calgary, 2003, P. 155.

৩. Zia Rahman, *Urban Policy in Bangladesh: The State, Inequality and Housing Crises in Dhaka City*, Alberta, Calgary, 2003, P. 155.

৪. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, mgvRieÁvb kã‡Kvl, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ২৮৬।

৫. Erving Goffnan, *Asylums : Essays on the Social Situation of Mental Patients and other Inmates*, Chicago, Aldine, 1961, P. 7.

৬. C.R. Kothari, *Research Methodology*, Kolkata: New Age International Publishers, 1988, P. 4.

৭. A. Bryman, *Quantity and Quality in Social Research*, London, Routledge, 1995 160, Zia Rahman, *Urban Policy in Bangladesh: The State, Inequality and Housing Crises in Dhaka City*, Alberta, Calgary, 2003, P. 155.

৮. Jenifer Mason, *Qualitative Researching*, London, Sage, 2000, P.149.

৯. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, mgvRieÁvb kã‡Kvl, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ৩৫০, ৪৫৪।

১০. Jenifer Mason, *Qualitative Researching*, London, Sage, 1995, P.149, Zia Rahman, *Urban Policy in Bangladesh: The State, Inequality and Housing Crises in Dhaka City*, Alberta, Calgary, 2003, P. 160.

তৃতীয় অধ্যায়

মতুয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে গবেষণা পদ্ধতি। সামাজিক গবেষণায় এটি অপরিহার্য। মতুয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে মতুয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক। মতুয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পটভূমির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে স্ব-শ্রেণির আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার করচন ইতিহাস। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় এ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর রাজবাড়ির জমিদার সূর্যমণি মজুমদার এবং পার্বতী চরণ মজুমদার কর্তৃক অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়ে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হারিয়ে সর্বহারা হন। ফলে স্থানান্তরিত হয়ে জমিদার রাম রত্ন রায়ের কর্তৃত্বাধীন বৃহত্তর ফরিদুরের তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহাকুমার (বতমান জেলা) ওড়াকান্দি গ্রামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। উল্লেখ্য ধর্ম প্রচারের জন্য শ্রী কৃষ্ণ, শ্রী চৈতন্য, মুহাম্মদ (দঃ) সহ প্রায় সব ধর্মাবতারকে স্থানান্তর হতে হয়। সে যাই হোক প্রকৃত সত্য হলো এ ঘটনা তাঁর মনে প্রবলভাবে রেখাপাত করে এবং ঘটনা পরম্পরায় তিনি শোষিত, বঞ্চিত এবং নির্যাতিত মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে লীলা মাধুর্য্যে আবিষ্ট হয়ে প্রচার সাপেক্ষে মতুয়া ধর্মান্দোলনে ব্রতী হন। সুতরাং এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে নিপীড়িত মানুষের বাস্তব জীবন সংগ্রামের আকাঙ্খাকে ধারণ করে বিকশিত হয়েছে মতুয়া মতবাদ ।[১] এ প্রসঙ্গে কবি গুরচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘প্রশ্ন’ কবিতার কয়েকটি চরণ প্রনিধানযোগ্য। এটি হচ্ছে-

ভগবান, তুমি যুগে যুগ দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে–
তারা বলে গেল ‘ক্ষমা করো সবে’; বলে গেল ভালোবাসা–
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো’...
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি ঠিক বেসেছ ভালো ?[২]

এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মতুয়া মতবাদ বা সম্প্রদায়ের উৎপত্তির পটভূমি আলোচনায় বৈদিক যুগের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খুবই গরচত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যিশু খ্রিস্টের জন্মের ১৫০০ থেকে ১৭০০ বছর আগে মতান্তরে ৩২০০ থেকে ৩৫০০ বছর আগে আর্য (বৈদিক) ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠী তাদের স্বদেশভূমি দক্ষিণ পূর্ব রাশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং মধ্য এশিয়ায় (প্রধানত দক্ষিণ পূর্ব রাশিয়া অঞ্চল এবং এর সংলগ্ন দেশ সমূহ) জীবন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে জীবিকার সন্ধানে চলে এসেছিলেন ভারতবর্ষে।[৩] ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম গিরিপথ প্রধানত কাশ্মীর অঞ্চল ছিল তাদের এ উপ মহাদেশে আগমনের প্রবেশ পথ। বৈদিক ভাষা ভিত্তিক এই জনগোষ্ঠী প্রাথমিকভাবে বসতি স্থাপন করে এই উপ-মহাদেশের সিন্ধু, পাঞ্জাব (পঃ), বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর এবং আফগানিস্তান অঞ্চলে।[৪] ভারতবর্ষে আসবার সময় তারা সংগে নিয়ে এসেছিলেন বৈদিক সংস্কৃতি। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় তাদের বেদান্ত দর্শনে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা বর্ণবাদ ছিল অনুপস্থিত। কিন্তু আর্য বা বৈদিক ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠী ভারত উপ মহাদেশে আগমনের পরবর্তী পর্যায়ে আদি গ্রন্থ বেদের তথাকথিত ব্যাখ্যার আলোকে সিন্ধু নদ অঞ্চলে চালু করেছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদ বা বর্ণবাদী সমাজ ব্যবস্থা (চার জাতি ৩৬ বর্ণ এবং ৬৭৪৩ শ্রেণি তত্ত্বে বিশ্বাস)।[৫] এটি পরবর্তীতে হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিতি পায়। হিন্দু ধর্মের আদি প্রবর্তক শম্বর-সীতা-ভরত। ভরতের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর অনুগামীরা তাদের বাসভূমির পূর্বনাম ‘অজনাভ’ বদলিয়ে রাখেন ভারতবর্ষ। ১৯২২-২৩ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক জন মার্শালের নেতৃত্বে হরপ্পা

মহেঞ্জোদারোতে যে খনন কাজ সম্পাদিত হয়েছিল তা থেকে জানা যায় সিন্ধু সভ্যতা বিশ্বের সর্ব প্রাচীন সভ্যতা।[৬] আর্য ভাষা ভাষী শম্বর-সীতা-ভরতের অনুসারীরা বাংলায় 'স' উচ্চারণ করতে না পারাই সিন্ধু ধর্মের পরিবর্তে এটি হিন্দু হিসেবে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের কাছে বেঁচে আছে। উল্লেখ্য খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে ১৩০০ অব্দ পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আরব সাগর পর্যন্ত প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে যে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাই হলো সিন্ধু সভ্যতা।[৭] বৌদ্ধ দর্শনের সূচনার মধ্য দিয়েই কার্যত তখন থেকেই এ অঞ্চলে শুরু হয়েছিল মতুয়া দর্শনের অগ্রযাত্রা। কিন্তু তখন এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে মতুয়া দর্শনের সম্প্রদায়গত আদর্শ ছিল পুরোপুরি অজানা। যদি আগে ভাগেই জানা বোঝা থাকত তাহলে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুরের বাংলায় ধর্মীয় আন্দোলনে এতটা উলোটপালোট ঘটত না, ঘটা সম্ভবও ছিলনা।

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা থেকে জানা যায় উচ্চবর্গীয় বৈষম্যবাদ রুখতে এবং বাংলার নিযার্তিত গণমানুষকে রক্ষা করতে মতুয়া আন্দোলনের পূর্বসূরী হিসেবে এ অঞ্চলে সর্ব প্রথম অবতাররূপে আবির্ভূত হন মহামানব গৌতম বুদ্ধ (৫৬৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ-৪৮৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ)। মতুয়া দর্শনের ন্যায় তাঁর চিন্তা চেতনাও ছিল বেদ বিরোধী। প্রথম দফায় গোটা ভারতবর্ষে তাঁর বৌদ্ধ চেতনার শাসন চলে যিশুখ্রিস্টের জন্মের ১৮৭ বছর পূর্ব পর্যন্ত।[৮] এর মধ্যে প্রভাবশালী বৌদ্ধ শাসক সম্রাট অশোকের শাসনামল ছিল ২৬৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ২৩২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত। সম্রাট অশোকের জন্ম হয় ৩০৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে।[৯] বৌদ্ধ শাসনের প্রথম আমল ছিল আর্যসৃষ্ট বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা আদি আন্দোলন। যেহেতু এই সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ বেয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মতুয়া ধর্ম আন্দোলন মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার সফলতার দরজায় তীব্রভাবে কড়া নাড়ে সেহেতু বলা যায় বৌদ্ধ শাসনের প্রথম যুগেই রচিত হয়েছিল মানবতাবাদী চেতনা মতুয়া আন্দোলনের প্রেক্ষাপট।

প্রসঙ্গত মতুয়া দর্শন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারনা থাকা প্রয়োজন। সাধারণ অর্থে 'ম' মানে আমি 'তু' মানে তুমি। সুতরাং 'মতুয়া' মানে আমার মাঝে তুমি এবং তোমার মাঝে আমি।[১০] শ্রী শ্রী হরিলীলামৃতে উল্লেখ আছে, ''যে যাহারে ভক্তি করে সে তাহার ঈশ্বর/ ভক্তিযোগে সেই তার স্বয়ং অবতার" ।[১১] অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অপর নাম মতুয়া দর্শন তথা মতুয়া মতবাদ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যিনি হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে প্রভু শ্রীহরির পবিত্র পাদ পদ্মে নিজেকে আত্ম সমর্পণ করেন তাকে 'মতুয়া' বলা হয়।[১২] এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায়, "হরিধ্যান হরিজ্ঞান হরিনাম সার/ প্রেমেতে মাতোয়ারা মতুয়া নাম যার" ।[১৩] তবে প্রাথমিকভাবে ব্রাহ্মণবাদীদের 'মতো' 'মতো' গালি পরবর্তীতে মতুয়া নামে পরিচিতি পায়।[১৪]

চলমান বৌদ্ধ শাসনের এক পর্যায়ে ১৮৭ খৃঃ পূর্বাব্দে বৌদ্ধ শাসক জয়দ্রথকে হত্যা করে উগ্রবাদে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিনিধি তারই আপন সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক পুষ্যমিত্র। প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন ব্যবস্থা।[১৫] যিশু খ্রিস্টের জন্মের একশ বছর আগে অথবা পরে কোন এক সময় রচিত হয় মনুসংহিতা। কুটিল প্রকৃতির ভৃগু ব্রাহ্মণের রচিত মনুসংহিতায় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের (চণ্ডালাদি) উপর নির্যাতনের যাবতীয় নীলনকশা স্থান পায়। ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দে আর্যসৃষ্ট বৈদিক শাসন বা ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনামল কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে। তারপর নানারকম ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে সামনে আসে মাৎস্যনায় বা সামাজিক নৈরাজ্যের যুগ। রাজা শশাঙ্কের রাজত্বের সময় বাংলার ইতিহাস ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। আন্তঃবিদ্রোহের কারণে গৌড় রাজ্য প্রায় ছিন্ন ভিন্ন হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে বিদেশী

শত্রুর আক্রমণ রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করে। সৃষ্টি হয় এক অস্থির পরিবেশ। লুপ্ত হয় অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা। ফলে খুন খারাপি এবং হানাহানি যায় বেড়ে। এটি হতাশা ও অস্থিরতার যুগ (৬০৬-৭০০ খ্রিঃ)। এই অরাজকতাই পাল তাম্রশাসনে মাৎস্যনায় বলে পরিচিত। অর্থনীতিবিদ কৌটিল্যের মতে, মৎস্যের রাজত্বের মত যেখানে বড় মাছ যথেচ্ছা ছোট মাছকে ভক্ষণ করে তাই হলো মাৎস্যনায়। পাল আমলের এই সময় ক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠী এবং সম্ভ্রান্ত বংশের দাবিদার ব্রাহ্মণ এবং বণিক সমাজ নিজ নিজ গৃহ এবং তার প্রভাবাধীন তৎসংলগ্ন আশ পাশের এলাকা শাসনের নামে শোষণ করতেন। এই যুগের স্থায়ীত্ব প্রবল আকার ধারণ করে সম্রাট শশাংকের শাসন ব্যবস্থা পর্যন্ত।[১৬] কোনো কোনো ঐতিহসিকের মতে এই অবস্থা চলতে থাকে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। ক্ষমতার পালা বদলে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে শাসন ক্ষামতায় আসে পাল রাজ বংশ। পাল রাজত্ব বা দ্বিতীয়বার বৌদ্ধ শাসনের সূচনা করে গোপাল দেব। মাৎস্যনায় থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাংলার কৌম সমাজের জনগণ একত্রিত হয়ে গোপালদেবকে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচিত করেছিল।[১৭] তাঁকে বলা হয় পাল রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা। এই সময় উগ্রবাদে বিশ্বাসী হলেও ব্রাহ্মণ সমাজের পক্ষে ধর্ম পালন এবং প্রচারণায় কোনো সমস্যা হয়নি। কেননা উদার মনোভাবাপন্ন পাল শাসকেরা ছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষ। তবে পাল রাজত্বের শেষ সময়ে কৈবর্ত বিদ্রোহ পাল শাসনে কালিমা লেপন করে। পাল কর্মচারী দিব্যের নেতৃত্বে শুরচ হওয়া কৈবর্ত সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ তৎকালীন দ্বিতীয় মহীপালের (১০৭০-১০৭৭) পাল সাম্রাজ্যের বিরচদ্ধে বিপ্লবকে বোঝানো হয়। ঐতিহাসিকভাবে এটিকে ভারতবর্ষের সফল বিদ্রোহও ধরা হয়। এই বিদ্রোহের মাধ্যমে কৈবর্ত্য সম্প্রদায় বরেন্দ্র অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অবশ্য ১০৮২ খ্রিস্টাদে পাল রাজা রামপাল সামন্ত রাজাদের সহযোগিতায় কৈবর্ত্য নেতা ভীমকে হারিয়ে পিতৃভূমি বরেন্দ্র পুনর্দখল করেন। এর ফলে বাঙালীদের প্রথম রাষ্ট্র বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১৮] এই ব্যর্থতার অব্যবহিত পরে একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সামন্ত সেনের মাধ্যমে আবারও সূচীত হয় বর্ণবাদী শাসন ব্যবস্থা। তবে সামন্ত সেন বয়ঃবৃদ্ধ থাকার কারণে তার স্থলে হেমন্ত সেন একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেন রাজত্বের নেতৃত্ব দেন। একারণে তাকে সেন রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়। এটি ছিল দ্বিতীয় বারের মত বঙ্গ[১৯] জাতির বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ শাসনামল। ‘বঙ্গ’ দেশটি গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল এবং ‘বঙ্গ’ জাতি ছিল বঙ্গ দেশের মূল নিবাসী। ‘চণ্ডাল’ (১৮৭২-১৮৮১), নমঃশূদ্র (১৮৯১, ১৯০১, ১৯১১) বলে চিহ্নিত জনগোষ্ঠী বঙ্গের মূল নিবাসী। এদের পেশা ছিল কৃষি।[২০] সে যাই হোক সামন্ত সেনের পরে ক্ষমতায় বসেন বল্লাল সেন (১১৬০–১১৭৮ খ্রিঃ)। তিনি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে নমঃশূদ্রদের চিত্রায়িত করলেন চণ্ডাল হিসেবে। তাঁর ভাষায় ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে যে জন্মগ্রহণ করবে সে হল ব্রাহ্মণ। পক্ষান্তরে শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভের সন্তান হলো চণ্ডাল। তিনি আরও ঘোষণা করলেন কুমারী মাতা, বিধবা মাতার সন্তানেরাও চণ্ডাল। পুরাণ মতে সনাতন হিন্দু শাস্ত্রে চণ্ড ছিল বদ চরিত্রের এক অসুর। দেবী দুর্গা তাকে বধ করে। একথা স্মর্তব্য যে, যিশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ১৫০০ বছর পূর্ব থেকে ভারতবর্ষে বর্ণবাদী চেতনা বিস্তার ঘটতে শুরু করলেও এটি কার্যত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় বল্লাল সেনের শাসনামলে। এক্ষেত্রে বাংলার সর্বশেষ সেন শাসক লক্ষণসেনের ভূমিকাও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। বল্লাল সেনের দীক্ষা গুরচ অনুরচদ্ধ ভট্ট বাংলা অঞ্চল থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিতাড়ন এবং বর্ণবাদের স্থায়ী রূপদাতাদের একজন।[২১]

বাংলা ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের মধ্যদিয়ে বাংলার এ অঞ্চলে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত ঘটে। অখণ্ড বাংলায় তখন শুরচ হয় সাড়ে পাঁচশত বছরের স্থায়ী মুসলমান শাসনামল।[২২]

রাজনৈতিকভাবে তখন থেকেই বাংলা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। এ সময় কোনো মুসলমান শাসকের উচ্চবর্গীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। তবে কিছুটা হলেও ব্যতিক্রম ছিল আলাউদ্দীন হোসেন শাহের শাসন আমল। তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহও ছিলেন উদারপন্থী শাসক। এজন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলন। এ সুযোগ গ্রহণ করেছিল বৈষ্ণব আন্দোলনের সমর্থক গোষ্ঠী।

মুসলমান শাসকদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এবং সুফিবাদের উদার প্রভাবে বর্ণবাদের হিংস্রতার অনল থেকে মুক্তি পেতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে, অনেকে গ্রহণ করে খ্রিস্টান ধর্ম। বৃটিশ শাসন শুরু হওয়ার আগে বাংলা তথা ভারতবর্ষে খ্রিস্টান ধর্মের কোনো অনুসারী ছিল না। ১৮৭২ সালের আদমশুমারী থেকে সাত লক্ষ সনাতনীর বিভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা জানা যায়।[২৩] আর ১৯০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলার এক কোটি নির্যতিত হিন্দু (পুণ্ড্র ক্ষত্রিয় এবং পোদ সম্প্রদায়) জনগোষ্ঠীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা জানা যায়।[২৪] ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পথ সৃষ্টি হয় মূলত খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে এই অঞ্চলে সুফিবাদের আগমনের মধ্য দিয়ে। সুতরাং ধারণা করা যায় এ অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক বিস্তারে উচ্চবর্গীয় বৈষম্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। উল্লেখ্য অন্ত্যজ হিন্দু জনগোষ্ঠীর ধর্মান্তর রোধে এবং ভারতবাসীকে এক মহাজাতিতে পরিণত করার অভিপ্রায় নিয়ে মতুয়া ধর্মের প্রবর্তন নি:সন্দেহে এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা।[২৫] সুতরাং বলা যায় ৭১২ খ্রিঃ মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়, ভারতবর্ষে ইসলামের বিস্তার এবং সুফিবাদের আগমন এসবই একই সূত্রে প্রবহমান। সে কারণে সতের বছর বয়সী মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয় অত্যাচরিত ব্রাহ্মণ রাজা দাহির। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম এমনি এমনি ভারতবর্ষে আসেননি। উচ্চবর্গীয় বৈষম্যের শিকার নিম্নবর্গীয় হিন্দু সমাজ তাঁকে এবং অন্যান্য মুসলমান শাসকদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষে।[২৬] এভাবে ভারতবর্ষ এবং বাংলা ভূখণ্ডে ইসলামের বিস্তার যেমন হয়েছে তেমনি উদ্ভব হয়েছে শতশত লোকধর্ম। উচ্চবর্গীয় বৈষম্যই যে এসব লোকধর্ম বা গণ মানুষের ধর্মের উত্থানের মূল ভূমিকায় ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। উচ্চবর্গীয় বৈষম্যের প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয়া অন্যতম একটি গণ মানব ধর্মের নাম মতুয়া সম্প্রদায় বা সুক্ষ্ম সনাতন ধর্ম। এই পর্যয়ে মতুয়া দর্শন কেন সুক্ষ্ম সনাতন নামে খ্যাত হলো তার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। যে ধর্ম মতে কথা এবং কাজের মূল ভিত্তি হল সত্য, পিতা মাতায় গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন, ষড় রিপুকে নিয়ন্ত্রণে রেখে নারীর পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করা, সর্বোপরি সকল ধর্মের প্রতি মর্যাদাশীল থেকে গার্হস্থ্য ধর্মকে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম কার্যত তাই হলো সুক্ষ্ম সনাতন ধর্ম। এ ধর্মে জগতকে প্রেম করার কথা বলা হয়েছে। বর্জন করতে বলা হয়েছে বর্ণভেদ, ছুৎমার্গ, আত্ম অহংকার এবং পরনির্ভরশীলতার মত সকল প্রকার ঘৃণিত কাজ। হাতে কাজ মুখে নাম করার মত উপার্জনক্ষম সহজ সরল জীবন বিধানকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে সুক্ষ্ম সনাতন ধর্মে।[২৭] এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় এটি একটি মানবতাবাদী মতবাদ। এটি শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের আন্দোলন। এটি বাংলায় বসবাসরত হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মগ, ফিরিঙ্গি, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ফরাসীসহ সকল নির্যাতিত শ্রেণির মুক্তির সনদ।

উল্লেখ করা প্রয়োজন মতুয়া আন্দোলনের গতিপথে গতি সঞ্চার করে বৈষ্ণব আন্দোলন। শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলন সুফিবাদের সমান্তরালে প্রচার করলেন সনাতন হিন্দু ধর্মে বর্ণবৈষম্যের কোনো স্থান নেই। কিন্তু ইসলামের জয় জয়কার বুঝেও উগ্রবাদে বিশ্বাসী ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণ সমাজ প্রতিক্রিয়াশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর (শ্রী চৈতন্য) বিরুদ্ধে

অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। অনুমিত হয় তারাই তাঁকে (শ্রী চৈতন্য) হত্যা করে। তাঁর (শ্রী চৈতন্য) অন্তর্ধান তথ্য আজও রহস্যাবৃত।[২৮] আর অন্যদিকে উপমহাদেশের মানবধর্ম গুলোর প্রচারক-প্রবর্তক যেই হোন না কেন তিনি নিজেকে দাবি করেছেন শ্রী চৈতন্যের উত্তর পুরুষ। তবে এই কথা ঠিক মতুয়া আন্দোলন উচ্চবর্গীয় বৈষম্যের বিপরীতে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার এক সফল আন্দোলন। আর এই আন্দোলন জন্মের পিছনের ইতিহাস হলো মহাত্মা হরিচাঁদ ঠাকুরের আগমন এবং তাঁর মানব মুক্তির তাত্ত্বিক দর্শন। তবে মতুয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির পটভূমি ব্যাখ্যায় হরিচাঁদ পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা আন্দোলনের ব্যাখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের বৃহত্তর ফরিদপুরের নমঃশূদ্র অধ্যুষিত ওড়াকান্দি গ্রাম হরিচাঁদ ঠাকুরের (১৮১২-১৮৮৭) অধ্যাত্মবাদী আদর্শিক চেতনাজাত মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্রস্থল। প্রতি বছর তাঁর জন্ম জয়ন্তী পালন উৎসব উপলক্ষে এখানে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ লোকের সমাগম ঘটে। আগেই বলা হয়েছে সামাজিক অনাচার এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈষম্যবিরোধী প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ। আন্দোলনের অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা দর্শন। এটি একটি সামাজিক আন্দোলন। প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন যেমন রক্ষণশীল খ্রিস্ট ধর্মের সংস্কার সাধন করে, সুফিবাদ যেমন বাংলায় সমন্বয়বাদ সৃষ্টি করে, বৈষ্ণব আন্দোলন যেমন বর্ণবাদে চিড় ধরায়, ব্রাহ্ম আন্দোলন যেমন সার্বজনীন একেশ্বরবাদের স্বপ্ন দেখায় ঠিক তেমনি মতুয়া আন্দোলন বর্ণবাদবিরোধী শক্তিশালি সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত করে। জাতিবর্ণ প্রথার বদ্ধমূল চেতনার বিপরীতে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল মতুয়া সংগ্রামের লক্ষ্য। আজও সে ধারা অব্যাহত স্ব শ্রেণির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায়।

শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক সুসংহত সামাজিক আন্দোলন মতুয়া সংগ্রাম। আর্য বা ব্রাহ্মণ আরোপিত জাতিবর্ণ প্রথা বা বর্ণ বৈষম্য থেকে বাঙালি নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সনদ হলো মতুয়া আন্দোলন। প্রমাণ স্বরূপ রাজা বল্লাল সেন আরোপিত 'চণ্ডাল' গালি মোচন হওয়ার উল্লেখ করা যায়। এটি সম্ভব হয় হরিচাঁদ পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে ১৯১১ খৃস্টাব্দে। তাঁর নেতৃত্বে অবহেলিত এই সমাজ চাকুরী ও শিক্ষার অধিকারও ফিরে পায় তাঁর জীবদ্দশায় (১৮৪৭-১৯৩৭)। বৃহত্তর ফরিদুরে ১০৬৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। সমাজিক আন্দোলন কার্যকরী রূপ দানের জন্য প্রতিটি মতুয়া সদস্যকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য ১৮৮১ সালে বাগেরহাটের দত্তডাঙ্গা গ্রামে ঈশ্বর গাইনের বাড়িতে ৫০০০ হাজার মতুয়া সদস্যকে শপথ পড়ানো হয়। তাঁর দর্শন ছিল বিদ্বান না থাকলে সে ঘরে বিদ্বানের জন্ম হয় না। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন,

সবাকারে বলি যদি মান্য কর মোরে।
অবিদ্বান সন্তান যেন নাহি থকে ঘরে।
খাও বা না খাও তাতে মোর দুঃখ নাই।
ছেলে পিলে শিক্ষা দাও এই আমি চাই।[২৯]

অগাধ প্রজ্ঞার অধিকারী গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতে কোনো জাতির মেরুদণ্ড হলো শিক্ষা এবং অর্থ। তাই মতুয়া মতবাদে গুরুত্বারোপ করে বলা হয়-গৃহধর্ম গৃহকর্ম করিবে সফল/হাতে কাম মুখে নাম ভক্তিই প্রবল"।[৩০] মানব সৃষ্ট অনাচার বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে এ সম্প্রদায় সকল প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে বর্ণবাদের পৃষ্ঠপোষক উচ্চবর্গীয় সমাজকে বর্জন করে। অন্তরে ধারণ করে শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন। যে স্বপ্ন নিয়ে মহাত্মা হরিচাঁদ দাঁড়ান ভাগ্যাহত কৃষকের পাশে। তিনি মূলত এ মতবাদের তাত্ত্বিক প্রবক্তা। আর গুরুচাঁদ হলেন সাংগঠনিক এবং প্রায়োগিক দিক পাল। তিনি বলেন,

যে জাতির রাজা নেই
সে জাতি তাজা নেই
যে জাতির দল নেই
সে জাতির বল নেই।[৩১]

এই সকল মন্ত্র ধারণ করে বাংলার নমঃশূদ্র সমাজ গুরচ্চাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল ভিত্তি শিক্ষা। এ কারণে গুরচ্চাঁদ ঠাকুর তাঁর অনুসারীদের বলেন,

জাতির উন্নতি যদি করিবারে চাও।
মানবের শুভ যাতে সেই পথ ধাও।
শিক্ষা হারা দীক্ষা হারা ঘরে নাই ধন।
এই সবে জানি আমি আপনার জন।[৩২]

মতুয়া দর্শনে গার্হস্থ্য ধর্মকে গুরচত্বের চোখে দেখা হয়। বলা হয় গৃহ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থান। গুরচ্চাঁদ ঠাকুরের মতে," বিদ্যাশূণ্য গৃহে কিন্তু অর্থ বৃথা যায়।"[৩৩] তিনি আরও বলেছেন, "বিদ্যার সমান বন্ধু নাহিক সংসারে"।[৩৪] শিক্ষার প্রতি গুরচত্বারোপ করে তিনি আরও বলেন, "বিদ্যা তরে যদি করে কেউ কিছু দান। জানিবে তাহার বংশে জন্মিবে বিদ্বান"।[৩৫] শিক্ষা দর্শনে উদ্বেলিত মতুয়া ভক্তদের কাছে মানুষই ঈশ্বর। অন্তরের অনুভূতির সাথে বাইরের প্রকাশের সাদৃশই এখানে মুখ্য। জীবন মুখী হরি সংগীত এবং মহা সংকীর্তন সৃষ্টি করে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় মতুয়া সম্প্রদায়ের নৈতিক প্রয়াসের একটি গুরচত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। অন্তঃসার শূণ্য কল্পনা ও ভাবাবেগে মতুয়া মত বিশ্বাস করে না। এটি ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী চেতনা লালনের প্রতিনিধিত্ব করে।

মতুয়া ভক্তরা হৃদয়ে ধারণ সুক্ষ্ম সনাতন চেতনা। কথা ও কাজের সাদৃশ্য, পিতা-মাতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তি, নারীর পূর্ণ মর্যাদাদান, অন্যান্য ধর্মের প্রতি মর্যাদারোপ, গার্হস্থ্য আশ্রমের প্রাধান্য এবং জীবে দয়া, নামে রচি, মানুষেতে নিষ্ঠা, বর্ণভেদ, ছুঁৎমার্গ, অহংকার, পরনির্ভরমীলতা ও বহির্মুখীতা হতে মুক্ত হয়ে হাতে কাজ ও মুখে নামের মত সহজ সরল পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানকেই বলা হচ্ছে সুক্ষ্মসনাতন ধর্ম। মতুয়া আন্দোলন রেঁনেসার সাথে তুলনীয়। বাংলা ভূ ভণ্ডে যে কয়টি ক্ষেত্রে রেঁনেসার সৃষ্টি হয় তার একটি হলো শিক্ষা। এই রেঁনেসার অন্যতম অগ্রপথিক গুরচ্চাঁদ ঠাকুর। এ কারণে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক সি.এস.মিড যখন গুরচ্চাঁদ ঠাকুরকে তাঁর লোকজনকে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের কথা বলেন তখন তিনি বলেন,

নমঃশূদ্র জাতি মোরা বিদ্যা ঘরে নাই।
ওড়াকান্দি গ্রামে গড়ো হাইস্কুল তাই।[৩৬]

শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যালয়ের গুরচত্ব অনস্বীকার্য। তাই শিক্ষা আন্দোলন সফল করতে এবং আদর্শ শিক্ষিত জাতি গঠনকল্পে স্কুলের গুরচত্ব বুঝাতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন,

যাক জান ধন মান তা'তে ক্ষতি নাই।
সব দিয়ে এই দেশে স্কুল রাখা চাই।[৩৭]

সাধন ভজনে মানবসেবা এবং সামাজিক অধিকার বেশী মাত্রায় প্রাধান্য পেয়েছে হরি-গুরচ্চাঁদের মতুয়া দর্শনে। অন্ন পাপ এবং জাত বিচার এখানে গৌণ। জীবিত বা মৃত কোনো মানুষকে নিয়ে জাত বিচার মতুয়া সম্প্রদায়ে মহা পাপ। তবে এ সব কিছুর মূলে ছিল তাদের মানবতাবাদী শিক্ষা আন্দোলন। তাই সার্বিক বিচারে মতুয়া দর্শন মানব সমাজে অক্ষয়-অব্যয়। সুতরাং বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য লালনে প্রাথমিক থেকে শুরচ করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্রই হরি-গুরচ্চাঁদের দর্শন চর্চা অপরিহার্য। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মণবাদীরা তাদের অপপ্রয়াস আজও থামায়নি। এই কারণে গুরচ্চাঁদের শিক্ষা দর্শন, রাজনৈতিক দর্শন যেমন উপেক্ষিত তেমনি উপেক্ষিত হরিচাঁদ ঠাকুরের সামাজিক আন্দোলনের তাত্ত্বিক চেতনা। তাই হরি-গুরচ্চাঁদের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলার আপামর শোষিত মানুষকে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। মতুয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির পটভূমি এজায়গা থেকে আজও বিচ্যুত হয়নি। গবেষণা সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে লোকধর্মীয় উপর একটি তাত্ত্বিক আলোচনা।

তথ্যপঞ্জি

১. অনুপম হীরা মণ্ডল, evsjv‡`‡ki †jvKag: `kb I mgvRZË, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১০ পৃ.২০, ৯৩।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, mÂwqZv, ঢাকা, টুম্পা প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ৩৪৭।

৩. মতুয়াচার্য নিত্যানন্দ হালদার, RwZi RbK ¸i"Pv`, ঠাকুর নগর, শ্রীমতি কমলিনী হালদার, ২০১২, ৫৭।

৪. সঞ্জীব কুমার দাস, gnwe‡`vnx nwiPv` VvKi, শ্রী ধাম ওড়াকান্দি, কেন্দ্রীয় মতুয়া মিশন, ২০১৩, পৃ. ৪৯। ও

৫. সঞ্জীব কুমার দাস, gnwe‡`vnx nwiPv` VvKi, শ্রী ধাম ওড়াকান্দি, কেন্দ্রীয় মতুয়া মিশন, ২০১৩, পৃ. ১৩।

৬. মতুয়াচার্য নিত্যানন্দ হালদার, RwZi RbK ¸i"Pv`, ঠাকুর নগর, শ্রীমতি কমলিনী হালদার, ২০১২, ১০।

৭. অনুপম হীরা মণ্ডল, evsjv‡`‡ki †jvKag: `kb I mgvRZË, ঢাকা, বাংলা একাডেমী,২০১০ পৃ.২০, ৫১।

৮. প্রফেসর মো আমির হোসেন মিয়া, mvgwRK BwZnvm I wekmf¨Zv, ঢাকা, গ্রন্থ কুটির, ২০১৪, পৃ.২৭১।

৯. https://bn.wikipedia:org/wiki অশোক-সম্রাট, ২৬/০৮/২০১৬।

১০. কালিদাস মণ্ডল, মতুয়া আন্দোলনের গবেষক, পাঙ্গাশিয়া, চিতলমারী, বাগেরহাট (টেলিফোনে প্রাপ্ত তথ্য), ১১/০৯/২০১৬ ইং।

১১. কবিরসরাজ শ্রীমৎ তারক চন্দ্র সরকার, kxkxnwijxjvgZ, গোপালগঞ্জ, ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়ি, বাংলা ১৪০৬ সাল, পৃ. ১।

১২. রতন কৃষ্ণ দাস, †QvU‡`i kx kx nwiPv` VvKit wK‡kvi ms¯‹iY, গোপালগঞ্জ, ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়ী, ২০১১, পৃ. ৩৭।

১৩. অধ্যাপক মাধব চন্দ্র রায়, m² mbvZb ag©, খুলনা, গল্লামারী, ২০০৮, পৃ.৪।

১৪. কবি রসরাজ শ্রীমত তারক চন্দ্র সরকার, kx kx nwijxjvgZ, গোপালগঞ্জ, শ্রীধাম ওড়াকান্দি, ১৪০৬ বাং, পৃ. ৬৭।

১৫. মতুয়াচার্য নিত্যানন্দ হালদার, RwZi RbK ¸i"Pv`, ঠাকুর নগর, শ্রীমতি কমলিনী হালদার, ২০১২, ১৬।

১৬. www.best to.com/questioned/38080, 02/08/16

১৭. মতুয়াচার্য নিত্যানন্দ হালদার, জাতির জনক গুরুচ্চাঁদ, ঠাকুর নগর, শ্রীমতি কমলিনী হালদার, ২০১২, পৃ.৬৪।

১৮. https:/bn.wikipedia. org/wiki/ 02/08/2016

১৯. উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বঙ্গ একটি জনগোষ্ঠী, উৎপল বিশ্বাস (সম্পাদিত), MYgw³t bgtk‡`i Drm mÜvbmsL¨v (সপ্তম সংখ্যা),ঢাকা, রামমকৃষ্ণ মিশন রোড, ২০০৬, পৃ. ৩৫।

২০. উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বঙ্গ একটি জনগোষ্ঠী, উৎপল বিশ্বাস (সম্পাদিত), MYgw³t bgtk‡`i Drm mÜvbmsL¨v (সপ্তম সংখ্যা),ঢাকা, রামমকৃষ্ণ মিশন রোড, ২০০৬, পৃ. ৩৮, ৩৯।

২১. মতুয়াচার্য নিত্যানন্দ হালদার, জাতির জনক গুরুচ্চাঁদ, ঠাকুর নগর,শ্রীমতি কমলিনী হালদার, ২০১২, পৃ.৭৪।

২২. মতুয়াচার্য নিত্যানন্দ হালদার, জাতির জনক গুরুচ্চাঁদ, ঠাকুর নগর,শ্রীমতি কমলিনী হালদার, ২০১২, পৃ.৭৬।

২৩. অধ্যাপক মাধব চন্দ্র রায়, m² mbvZb ag©, খুলনা, গল্লামারী, ২০০৮, পৃ.৪২ ।

২৪. সঞ্জীব কুমার দাস, gnwe‡'vnx nwiPv' VvKi, শ্রী ধাম ওড়াকান্দি, কেন্দ্রীয় মতুয়া মিশন, ২০১৩,,. ১৯।
২৫. মতুয়াচার্য নিত্যানন্দ হালদার, জাতির জনক গুরুচ্চাঁদ, ঠাকুর নগর,শ্রীমতি কমলিনী হালদার, ২০১২, পৃ.১১।
২৬. সঞ্জীব কুমার বিশ্বাস, gnwe‡'vnx nwiPv' VvKi, কেন্দ্রীয় মতুয়া মিশন, শ্রীধাম ওড়াকান্দী, ২০১৩, পৃ.১৩।
২৭. অধ্যাপক মাধব চন্দ্র রায়, m² mbvZb ag©, খুলনা, গল্লামারী, ২০০৮, পৃ.৪৬ ।
২৮. অনুপম হীরা মণ্ডল, evsjv‡'‡ki †jvKag 'kb I mgvRZË, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১০।
২৯. নিত্যানন্দ হালদার, RwZi RbK ¸i"Pv', উত্তর চব্বিশ পরগোনা, ঠাকুর নগর, ২০১২, পৃ. ১৪০।
৩০. কবি রসরাজ শ্রীমত তারক চন্দ্র সরকার, kÖx kÖx nwijxjvgZ, গোপালগঞ্জ, শ্রীধাম ওড়াকান্দি, ১৪০৬ বাং, পৃ. ৮।
৩১. সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস, gZqv ag GK ag wecøe, কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ২০০৮, পৃ. ৫৯।
৩২. নিত্যানন্দ হালদার, RwZi RbK ¸i"Pv', উত্তর চব্বিশ পরগোনা, ঠাকুর নগর, ২০১২, পৃ. ১৪১।
৩৩. আচার্য মহানন্দ হালদার, 'শিক্ষা বিস্তারকল্পে শ্রী শ্রী গুরুচ্চাঁদ', শ্রী বিষ্ণুপদ বাগচী (সম.) kÖx kÖx ¸i"Pv' PwiZ, বাগেরহাট, বেতকাটা, ২০১৩, পৃ. ১০২।
৩৪. আচার্য মহানন্দ হালদার, 'শিক্ষা বিস্তারকল্পে শ্রী শ্রী গুরুচ্চাঁদ', শ্রী বিষ্ণুপদ বাগচী (সম.) kÖx kÖx ¸i"Pv' PwiZ, বাগেরহাট, বেতকাটা, ২০১৩, পৃ. ১০৭।
৩৫. আচার্য মহানন্দ হালদার, 'শিক্ষা বিস্তারকল্পে শ্রী শ্রী গুরুচ্চাঁদ', শ্রী বিষ্ণুপদ বাগচী (সম.) kÖx kÖx ¸i"Pv' PwiZ, বাগেরহাট, বেতকাটা, ২০১৩, পৃ. ১০৭।
৩৬. শ্রী কান্ত ঠাকুর, 'শ্রী শ্রী গুরুচ্চাঁদের প্রতি ডা. সি.এস. মিড', সুধাংশু শেখর মালাকার (সম.) kÖx kÖx †Mvcvj Pv' PwiÎ mav, খুলনা, মিয়াপাড়া মেইন রোড, ২০১৫, পৃ. ৪৫।
৩৭. শ্রী কান্ত ঠাকুর, 'শ্রী শ্রী গুরুচ্চাঁদের প্রতি ডা. সি.এস. মিড', সুধাংশু শেখর মালাকার (সম.) kÖx kÖx †Mvcvj Pv' PwiÎ mav, খুলনা, মিয়াপাড়া মেইন রোড, ২০১৫, পৃ. ১০৮।

চতুর্থ অধ্যায়

লোকধর্মীয় সম্প্রদায় ঃ একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মতুয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তির পটভূমি। বর্তমান অধ্যায়ে গবেষণার গুরচত্ব অনুযায়ী সমাজ তাত্ত্বিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হবে। এটি বর্তমান গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট। লোকধর্মের চেতনায় মতুয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক আন্দোলন বিশ্লেষণ করার পূর্বে সমাজবিজ্ঞানের যেসব তাত্ত্বিক আলোচনা এর সাথে সম্পর্কিত সে বিষয় আলোচনা বিশেষ গরুত্ব বহন করে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ধর্মীয় উপ-গোষ্ঠীর মত মতুয়া সম্প্রদায়ও একটি ক্ষুদ্র ধর্মীয় উপ-গোষ্ঠী (sect)। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মতুয়া সম্প্রদায়ের উপর তাত্ত্বিক আলোচনার একটি বড় অংশই ধর্ম ও ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। এ কারণে ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। একই ভাবে ধর্মীয় আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও এ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অন্যদিকে মতুয়া সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর সামাজিক আন্দোলনের বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনাও তাৎপর্যপূর্ণ।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো মাথায় রেখেই আলোচ্য অধ্যায়ের প্রথম অংশে আমি ধর্ম এবং ধর্ম সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব। দ্বিতীয় অংশে আমি ধর্মীয় আন্দোলন ও উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং সর্বশেষে উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে লোকধর্মের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবো।

৪.১ ধর্ম এবং ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ

ধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণে ধর্ম যাজক (priest) ও সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। ধর্মযাজকদের কাছে ধর্ম পাপ পূণ্যের সীমা নির্দেশক হলেও সমাজবিজ্ঞানীরা এটিকে দেখেছেন সমাজের প্রয়োজনে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে। সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কার্ল মার্কস, এমিল ডুর্খেইম, ম্যাক্স বেবার গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে Giddens (2009) এর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তাঁর মতে,

> Sociological approaches to religion are still strongly influenced by the ideas of the three classical sociological theorists: Marx, Durkheim and Weber. None of the three was himself religious…. Each believed that religion is in a fundamental sense an illusion.[১]

Giddens এর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে কার্ল মার্কস, এমিল ডুর্খেইম এবং ম্যাক্স বেবার তিন জনই ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। ধর্মকে একই সাথে তাঁরা কেউ কেউ মোহ (illusion) হিসাবে এবং কেউ কেউ আফিমের (opium) সাথে তুলনা করেছেন। আমি মনে করি ধর্ম সম্পর্কে, ধর্মের আন্দোলন সম্পর্কে বুঝতে হলে সর্ব প্রথম এই সমাজবিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক আলোচনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরী। এই প্রেক্ষিতেই আমি প্রথমে ধর্মের মার্ক্সীয় এবং ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব।

৪.১.১ ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি

ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি সমলোচনামূলক। কার্ল মার্কসের দৃষ্টিতে ধর্ম মূলত সমাজের শাসক শ্রেণীর শোষণের একটি প্রধান হাতিয়ার। বিভিন্ন সমাজে ধর্ম শাসক শ্রেণীর তথাকথিত সমাজ নিয়ন্ত্রণের একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এ প্রেক্ষিতে ধর্ম সম্পর্কে কার্ল মার্কস এবং তাঁর বন্ধু এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে আহমেদ ও চৌধুরী (২০০৩) বলেন,

> ধর্ম নীতিগতভাবে বিদ্যমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিন্যাসকে সমর্থন যোগায়। ধর্ম হচ্ছে অধিপতি শ্রেণীর মতাদর্শের উৎপাদন। এটি একইসাথে সেই শ্রেণীর আধিপত্যকে বৈধতা ও স্বাভাবিকত্ব দান করে এবং নিপীড়িত মানুষের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে পরজগতে মুক্তির আশা ভরসা প্রদানের মাধ্যমে ধর্ম ইহজগতের নিপীড়নকে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানায়।[২]

তবে কার্ল মার্কস এবং এবং তাঁর সহযোগী ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ধর্মকে শ্রেণী স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার কথা বললেও তারা এটিও বলেছেন যে ধর্মীয় আন্দোলন অনেক সময় বঞ্চিত মানুষের আন্দোলনরূপে আবির্ভূত হয়।[৩] তাঁদের দৃষ্টিতে শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস হচ্ছে ধর্ম। এর ফলে আন্দোলনের পথ তৈরী এবং ধর্ম ব্যবহার কারী শোষকের শাস্তির পথ নিশ্চিত হয়। এটি বিবেকহীন বিশ্বের আবেগ। এই কারণে মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক তত্ত্বে (dialectical theory) বলা হয়েছে প্রচলিত ক্ষমতাকে অস্বীকার করার জন্যই ধর্মের আন্দোলন ঘটে।[৪] মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যায় এটি মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, বঞ্চিত মানুষের আন্দোলনের মধ্যদিয়ে উৎপত্তি লাভ করে একটি লোকধর্ম, একটি উপ-ধর্মীয় চেতনা। খ্রিস্টান ধর্ম এবং পরবর্তীতে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের উৎপত্তির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলেও এর সত্যতা পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস এবং তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস খ্রিস্টান ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, এই ধর্মের উৎপত্তির সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অন্তর্ভুক্ত আছে যা আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাঁদের দৃষ্টিতে এটি প্রাথমিকভাবে উৎপীড়িত মানুষের আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে তারা দাস সমাজ, অধিকার বঞ্চিত রোম সমাজ এবং ছত্রভঙ্গ অন্যান্য জাতির ধর্ম হিসেবে খ্রিস্টান ধর্মের উৎপত্তির প্রেক্ষাপট দেখতে চেয়েছেন।[৫] এই প্রসঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মের মিলেনিয়াম স্বর্ণযুগ সম্পর্কে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস যে বক্তব্য দিয়েছেন তা অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য। তাঁদের বক্তব্যের একটি চুম্বকীয় অংশ পাওয়া যায় আহমেদ ও চৌধুরী (২০০৩) এর বক্তব্যে। তাঁদের মতে,

> মধ্যযুগের সমস্ত গণ আন্দোলনের মত এই সব অভ্যুত্থানের ধর্মীয় মুখোশ পরাটা ছিল অপরিহার্য্য। আর সেটাকে মনে হয়েছিল বিস্তৃততর হতে থাকা অধঃপতন থেকে গোড়ার দিককার খ্রীস্ট ধর্মের পুনঃস্থাপন বলে, কিন্তু ধর্মের মহিমান্বয়নের পিছনে প্রতিবারই ছিল খুবই স্পষ্ট বাস্তব বৈষয়িক স্বার্থ।[৬]

উল্লিখিত বক্তব্য থেকে বোঝা যায় বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণে ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে। খ্রিস্টান ধর্মের উৎপত্তির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। শাসকের ইচ্ছায় ধর্ম যাজক (priest) কায়েমী স্বার্থে ধর্মের নতুন নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করে। সুতরাং আমার কাছে মনে হয়েছে মার্কস ও এঙ্গেলসের দৃষ্টিতে ধর্ম হলো শাসকের মতাদর্শগত উৎপাদন। কিছুটা ভিন্নতা সত্ত্বেও এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বেবারের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

সুতরাং কার্ল মার্কসের মত বেবারও মনে করেন কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা ধর্মকে ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।[৭] তবে বৈষম্যের প্রতিবাদ জানাতে শাস্ত্রীয় ধর্মের সমান্তরালে অনেক সময় অনেক নতুন নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায় বা লোক সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। উদাহরণ হিসেবে Protestant ধর্মের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ম্যাক্স বেবার এবং এমিল ডুর্খেইম ক্রিয়াবাদী চেতনার জনক। তাই আমি পরবর্তী উপ অংশে (sub section) ধর্মের ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।

৪.১.২ ধর্ম সম্পর্কে ক্রিয়াবদী দৃষ্টিভঙ্গি

ধর্ম সম্পর্কে ক্রিয়াবাদী (functional) দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন ম্যাক্স বেবার এবং এমিল ডুর্খেইম। এই পর্যায়ে প্রথমেই আসা যাক Durkheim (1912) এর ব্যাখ্যায়। তাঁর মতে, ধর্ম সমাজ থেকে উৎপত্তি হলেও এটির মুল লক্ষ্য সামাজিক সংহতি (social solidarity) বজায় রাখা। এই কারণে প্রত্যেক ধর্মেরই রয়েছে কিছু আচার, বিশ্বাস (rituals), মূল্যবোধ (values)। একই সাথে বিশেষ করে প্রাচীনকালের, প্রত্যেক ধর্মেরই রয়েছে কিছু টোটেম (totem), যা তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ঐ সব টোটেমকে ঘিরে রয়েছে কিছু বিধি-নিষেধ বা ট্যাবু।[৮] এই কথা অনস্বীকার্য যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মীয় উপগোষ্ঠীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো এদের স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন ধর্মীয় উপ শ্রেণীসমূহ কিভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার, মূল্যবোধ প্রভৃতি অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজ নিজ স্বকীয়তা ও পরিচয় (identity) নিয়ে বেঁচে আছে তা অবশ্যই আলোচনার দাবী রাখে।

এবার আসা যাক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ ম্যাক্স বেবারের ব্যাখ্যায়। ক্রিয়াবাদী সমাজবিজ্ঞানী Weber (1963) থেকে জানা যায়, যারা ধর্ম বিশ্বাস করে তারা অতি প্রাকৃত শক্তি মানায় (Mana) বিশ্বাস করে। এ কথা স্বীকৃত যে মানার উপর ভর করে কিছু কিছু সংঘ, সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এই গুলো সাধারণ মানুষের কাছে স্রষ্টা প্রদত্ত বলে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা এভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রার্থনা, বন্দনা, পূজা ইত্যাদি ক্রিয়াবাদী (functionalist) ধারণারই প্রকাশ।[৯] ধর্মের এসব ক্রিয়াবাদী ব্যাখ্যার সাথে লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সম্পর্ক কি ধরণের তাও আলোচনার দাবী রাখে।

কার্ল মার্কস ধর্মের দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব (dialectical theory)-এর প্রবক্তা। কোন কোন সময় তাঁর বক্তব্যের সাথে Max Weber এর বক্তব্যের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে Emile-Durkheim-এর মতে ম্যাক্স বেবারও একজন ক্রিয়াবাদী (functionalist) সমাজবিজ্ঞানী। উল্লেখ্য মার্ক্স, বেবার ও ডুর্খেইমের ধর্ম সংক্রান্ত তত্ত্বের মূল পার্থক্যটি খুবই স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন Giddens (2009)। তাঁর মতে,

> ... to Marx religion provides justification for the inequalities of wealth and power found in society; to Durkheim, religion is important because of the cohesive functions it serves ...to Weber religion is important because of the role it plays in social change...[১০]

Giddens এর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় তিন জন সমাজবিজ্ঞানী তিন ভাবে ধর্মের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। আমার কাছে মনে হয়েছে নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে শাসক শ্রেণী ধর্মের আশ্রয় নেয়। ধর্মীয় আচরণের ছদ্মাবরণে সংকীর্ণ স্বার্থ

আদায়ে ধর্ম যাজক ও শাসক গোষ্ঠীর এ জায়গাটায় বিস্তর মিল পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ধর্মে যাই থাকুক স্বার্থের প্রশ্নে তারা ধর্মের অলৌকিক ও ভীতিকর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেয়। একই সাথে আমার কাছে এও মনে হয়েছে যে নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদী চেতনা থেকে অনেক ধর্ম ও উপ-ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। ভারত উপমহাদেশে এ বাস্তবতার সন্ধান মেলে। উদহারণ স্বরূপ বলা যায় ভারত বর্ষে একশত একান্নটি লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এই সংখ্যা ছাপ্পন্ন।[১১]

ধর্মের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা এবং ক্রিয়াবাদী ব্যাখ্যার সাথে ধর্মীয় আন্দোলন ও উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একটি যোগসূত্র রয়েছে। এই কারণে পরবর্তী অংশে (section) আমি ধর্মীয় আন্দোলন ও উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

৪.২ ধর্মীয় আন্দোলন ও উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়

যে কোন আন্দোলনের একটি প্রেক্ষাপট থাকে। ধর্মীয় আন্দোলনও এর বাইরে নয়। সামাজিক ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ করলে এটি বোঝা যায় যে শাসক এবং যাজক সম্প্রদায়ের ধর্মের অপব্যবহার ও অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। খ্রিস্ট ধর্মের পোপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাথলিক চার্চের মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদ জানাতে এ আন্দোলন সুসংহত হয়। নিপীড়িত জনতা সব সময় শোষণ নিপীড়ন থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। এই সময় তারা শাস্ত্রের শাসন এবং শোষকের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে। মূলতঃ ক্যাথলিক ধর্মের রক্ষণশীল আচরণের বিরুদ্ধে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় মার্টিন লুথার।[১২] বিদ্রোহ ও পরিবর্তনের পরিবেশ কেবলমাত্র যীশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানবাদী ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেনি। ওটি ছিল ধর্ম সংস্কার আন্দোলন বেগবান করার একটি উপলক্ষ মাত্র। প্রচলিত ধর্মবোধ, চিন্তা ও চর্চার প্রতি মানুষের অনাস্থার চেতনা জাগ্রত হয় এবং মানস জগতে পরিবর্তনের ভিত রচনা হয়। ধর্মীয় ও উপ-ধর্মীয় আন্দোলনের সাথে এটি কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এই আলোকে চরম অবস্থা বুঝতে ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে যে সংস্কার ও পুনর্গঠন দাবি করা হয়েছিল সেটিও বোঝা দরকার। তবে এটি বোঝা যায় যে, সমাজস্থ মানুষের জীবনে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচলিত ধর্মবোধ, চিন্তন ও চর্চা সম্পর্কে ধীরে ধীরে অনাস্থা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। ফলে মানুষের মধ্যে আশা আকাঙ্খার ভীত মজবুত হয়। এভাবে পাশ্চাত্য সমাজে মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় Protestant ধর্মীয় আন্দোলন। এটি হলো রক্ষণশীল ক্যাথলিক ধর্মীয় মতবাদ থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা। ঐতিহাসিক বিচারে যাকে বলা হয় ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। Weber (1963) এর বিবেচনায় এভাবে সমাজ চার্চের প্রভাবমুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশে ধর্ম চর্চা শুরু করে এবং সমাজে পুঁজিবাদী চেতনা বিকশিত হতে শুরু করে।[১৩] পরবর্তীতে ফরাসী বিপ্লব এটিকে আরও ত্বরান্বিত করে। ব্যাপক অর্থে প্রোটেষ্ট্যান্ট আন্দোলন ইহজাগতিকতার চেতনাকে বিকশিত করে।

পাশ্চাত্যের ধর্মীয় আন্দোলন জানার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। ভারতবর্ষে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন যীশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ছয়শত বছর আগে শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে মণ্ডল (২০১০) এর বক্তব্য অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য। তাঁর মতে,

> খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ধর্মীয় জীবনে একটি বড় ধরণের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। দুইজন ধর্মীয়বেত্তা ভারতীয় তথা বাঙালীর অধ্যাত্ম সাধনায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেন। মনুষ্য জীবনের জরা-জীর্ণতা শোক-তাপ হতে মুক্তির প্রয়াসে আত্মনিবেদন করেন দুই তাপস, বর্দ্ধমান মহাবীর (৫৪৭ খ্রীঃ পূর্ভ-৪৭৭খ্রীঃ) এবং গৌতম বুদ্ধ (৫৬৩খ্রীঃ পূর্ব-৪৮৩ খ্রীঃ পূর্ব)।[১৪]

গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধ ধর্ম এবং বর্দ্ধমান মহাবীর প্রবর্তিত জৈন ধর্ম যাত্রা শুরুর প্রায় এক যুগ অতিক্রম করার পরে খ্রিস্ত্রীয় সপ্তম অষ্টম শতকে বর্ণবাদের রোষানল থেকে বাঁচতে এই অঞ্চলের মানুষ ইসলাম ও সুফি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। তারপর দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় খ্রিস্ত্রীয় ষোড়শ শতকে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের যুগে সুফি আন্দোলনের সমান্তরালে শুরু হয় উপ-ধর্মীয় বৈষ্ণব আন্দোলন।[১৫] এই আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ হলো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। এই সকল সম্প্রদায় শাস্ত্রীয় নিয়ম কানুনের তথাকথিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সক্ষম হয়। শোষিত মানুষেরা ধর্মীয় উপ-সম্প্রদায়ের বিধি বিধানের মাঝে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ফিরে পায়। এই সময় শাস্ত্রীয় ধর্মের বিধিবিধান অন্যভাবে ব্যাখ্যা হতে শুরু করে। এতে ধর্মযাজকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাঁধে এবং শ্রেণি বিভক্ত সমাজে এভাবে স্বতন্ত্র শ্রেণি, পেশা ও গোষ্ঠীর মানুষ তৈরী হয়।[১৬] এই সকল উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় পরবর্তীতে মানবতাবাদ এবং ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রতিভূরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং উপমহাদেশের লোকধর্মের সাথে একাত্ম হয়ে সমন্বয়বাদী চেতনায় বৈষম্যের বিরুদ্ধে নানাভাবে ভূমিকা পালনে তৎপর থাকে। এই প্রেক্ষিতেই উপ-ধর্মীয় বিশেষ সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে এবং নগর ছেড়ে গ্রামের পরিবেশে উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আন্দোলন বিকশিত হয়। এই পর্যায়ে আমি পরবর্তী অংশে (section) উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং লোকধর্ম প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করব।

৪.৩ উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় ও লোকধর্ম

উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, লোকাচার, আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রান্তীক জনগোষ্ঠীর লালিত লোকধর্ম। সমাজতাত্ত্বিকভাবে যাকে sect বলা হচ্ছে, সেটি লোকধর্ম (folk religion)। লোকধর্মের সদস্যরা যে নিয়ম কানুন পালন করে সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় তা ধর্মীয় প্রথা (cult)। এটি সংস্কৃতির উপশাখা।[১৭] উপ- ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা মনে করে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি মজবুত। এই কারণে শাস্ত্রীয় ধর্মের ন্যায় উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় যেমন নানা রকম ট্যাবু (taboo) বা নিষেধাজ্ঞার বিধান করেছে তেমনি এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন রকম মানা (mana), সর্বপ্রাণবাদ (polytheism), মহাপ্রাণবাদ (animatism) প্রভৃতিতে বিশ্বাস। তবে মূল ধারা থেকে এসব উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় (sect)-এর প্রথা (cult) সমূহ বিচিত্র এবং অনন্য। ক্ষুদ্র উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ও পারলৌকিক ক্রিয়ায় নানা রকম আচার আচরণ পালন করে। এ সম্পর্কে Bhushan (2003) বলেন,

> a cult is the beliefs and practices of a particular group in relation to a god or gods. In sociology it is often associated with the discussion of church, sect, typologies. The cult is regarded as a small, flexible group whose religion is characterized by its individualism, syncretism and frequently esoteric belief.[১৮]

Bhushan এর বক্তব্য থেকে এটি বোধগম্য যে একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং অনুশীলনের সাথে ধর্মীয় প্রথার সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং অনুমান করা যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, ভুমিকম্প, দুর্জয় রহস্যসহ যে কোন ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর মানুষ নানা রকম দেব, দেবী তথা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করে। একইভাবে পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসহ প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে নানাবিধ প্রথার প্রচলন দেখা যায় বিভিন্ন উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ে। ধর্ম

পালনে উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা প্রচলন করে নানা রকম আচার বিচার, লোক প্রথা, লোকবিশ্বাস। সামাজিক প্রবাহের ধারায় ধীরে ধীরে তাদের আশ্রিত ও লালিত মানা, আচার, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, গান, বাজনা লোকধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে যায়। নৈর্ব্যক্তিক কল্পনায় সংগীত হয়ে দাঁড়ায় উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় ও লোকধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।[১৯] এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ে সংগীতসহ আরও অন্যান্য লোকাচার অবশ্য পালনীয় লোকধর্ম হিসেবে (mores) পরিগণিত হয়। উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের আচরিত লোকাচার, লোকবিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধসহ তাদের আচরিত সবকিছুকেই স্বতন্ত্র ধর্মের মর্যাদা হিসেবে পালন করে। এটি মূল ধারার ধর্মীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি পালিত হয়। উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ (২০০৪) এ বলা হয়েছে,

> লোকধর্ম[১] অভিজাত ধর্মের [মূল ধারার] পাশে পাশে গড়ে ওঠে। এর প্রাণবীজ থাকে লৌকিক জীবনে ও লোকায়ত যাপনে। আমাদের দেশে বেদ, ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্র অনুশাসিত যে অভিজাত ধর্ম তার সমান্তরাল কিংবা প্রতিবাদে নানা যুগেই লৌকিক ধর্ম গড়ে উঠেছে।[২০]

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-ধর্মীয় গোষ্ঠী বনেদি ধর্মের পাশাপাশি গড়ে ওঠে। এর মূল পৃষ্ঠপোষক গ্রামের সহজ-সরল সাধরণ মানুষ। একইভাবে শাস্ত্রের শাসন অথবা ব্রাহ্মণ আরোপিত জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাতে উন্মেষ ও বিকাশ লাভ করে বিভিন্ন উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়। এক্ষেত্রে এটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে, অন্ধবিশ্বাস আর অবচেতন মনে ধর্মীয় উপ-সম্প্রদায় গুলো ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ, কবজ অথবা মন্ত্র তন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করে। আস্থা তৈরী করে ভেষজ লতা-পাতা, শেকড়-বাকলের গুণের উপর। এই গুলো ধীরে ধীরে লোকধর্মের অবিচ্ছেদ্য উপাদানে রূপান্তরিত হয়। সন্তানের নামকরণ অথবা বিয়েতে তাদের নিজস্ব ধারায় নানারকম আচার, বিশ্বাস, প্রথা ও লোকরীতি পালন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-ধর্মীয় গোষ্ঠী গুলো। বিয়ের অনুষ্ঠানে গায়ে হলুদ, গুরু মন্ত্র গ্রহণ, নবজাতকের জন্ম উৎসব এই সকল বিষয়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে নানা রকম উৎসব অনুষ্ঠান।

উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির একটি প্রধান বিষয় হলো মাজার পূজা, পীরপূজা, গুরু পূজার রেওয়াজ। এটি সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ ও বাউল মতবাদে কিভাবে সম্পর্কিত তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। লোকধর্মে পীর, মাজারকে ঘিরে সাধারণ মানুষের নানারকম বিশ্বাস, ভয়, ভক্তি ও আচার অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই ধরণের বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে উঠা প্রসঙ্গে ওয়াহাব (২০০৮) এর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তাঁর মতে,

> শাস্ত্রের নামে পুরোহিত তন্ত্র বা মোল্লাতন্ত্র উপাসনার নামে মন্দির মসজিদকে বড় করে তোলা, ঈশ্বরের নামে মূর্তি গঠন এসব লৌকিক সাধকের মনে ধরেনি। ধর্মের ছলে নানা বাহ্য বিষয় থেকে নিক্রমনের একটা পথ তারা সৃষ্টি করেছিলেন। লোক ধর্মের উপাস্য মানুষ।[২১]

ওয়াহাবের বক্তব্যে বোঝা যায় শাস্ত্র, মন্দির, মসজিদ, মূর্তি অপেক্ষা উপ-ধর্মীয় বা ক্ষুদ্র ধর্মীয় সম্প্রদায় মানবসেবাকে বেশী মাত্রায় প্রাধান্য দেয়। তাদের মূল উপাস্য মানুষ। এই বক্তব্যে লোকধর্মের উপাদানের সাথে উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় (sect), উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপাদান (sub sect), প্রথা (cult) এর যে সম্পর্ক আছে তা বোঝা যায়। সুতরাং বলা যায় লোকধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি নিরক্ষর ও অল্প শিক্ষিত লোকের আশ্রয়পুষ্ট উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় প্রার্থনায় ব্যবহৃত ধর্মীয় প্রথার (cult) সমাবেশ। তবে এগুলো লোকধর্মের অপরিহার্য্য অংশ। ধর্ম যেখানে সংস্কৃতির উপাদান সেখানে উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার চর্চিত বিষয় গুলোও সংস্কৃতি ও লোকধর্মের উপদান হবে- এটিই স্বাভাবিক। শাস্ত্রীয় ধর্মের অপশাসন থেকে বেরিয়ে আসতে উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আন্দোলন তাদের সংগীত ও প্রথা প্রতিবাদের মাধ্যমে লোকধর্মের সাথে একীভূত হয়।

---

১. উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে।

তবে একথা ঠিক যে নিরক্ষর অথবা স্বল্পশিক্ষিত অথচ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন উদার মানবতাবাদী লোকেরাই উদ্ভাবন করেছে বহুবিধ উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়। এই উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা বঞ্চনা হতে মুক্তি পেতে শাস্ত্রীয় ধর্মের আচার (rituals), বিশ্বাস (beliefs), মূল্যবোধ (values), আদর্শ (norms) প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং বলা যায় সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা প্রসূত ও আচরিত ইহজাগতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ধর্মই হলো উপ-ধর্ম এবং এর সংস্কৃতি। এরা যা কিছু চর্চা করে তাই অনিবার্যভাবে আমাদের লোকধর্মের উপাদান। এটি ইহজাগতিক মৌলিক প্রয়োজনের সাথে বেশি মাত্রায় সংশ্লিষ্ট।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যুক্তিসংগত বলে মনে হয়েছে। প্রথমত, ক্ষুদ্র চেতনাধারী উসম্প্রদায়গুলো ইহজগতের জীবন ভাবনাকে মুখ্য করে দেখে। এটি যে কোন উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়ত, উপধর্মীয় সম্প্রদায় সর্বদাই সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। সকল শ্রেণি পেশার মানুষের মঙ্গল কামনা উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য দিক। জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকল ধর্মের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার অবাধ স্বাধীনতা এখানে উম্মুক্ত। তৃতীয়ত, উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো কখনই স্থবির চিন্তা-চেতনা লালন করে না। মুক্ত চিন্তা এবং স্বাধীন অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতায় এরা বিশ্বাস করে। এটি পরিবর্তনশীলতায়ও বিশ্বাস করে। কেবলমাত্র তারটাই ঠিক অন্য গুলো মিথ্যা এই ধারণায় উপধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিশ্বাস করা হয় না। চতুর্থত, উপধর্মীয় সম্প্রদায় জীবন বিধানের দাবি সংবলিত সমাজ ও রাষ্ট্র স্বীকৃত কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ মানতে নারাজ। এটি সব সময় শাস্ত্রীয় ধর্মের কঠোরতার বিরোধিতা করে। ধর্মহীন, নাস্তিক, কাফের, অবিশ্বাসী, অমার্জিত এরূপ শব্দের ব্যবহার তাদের অপছন্দ। পঞ্চমত, বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয় কোন শাস্ত্রাচার ও বিধিবদ্ধ নিয়ম তারা মানতে চায়না। উপধর্মীয় সম্প্রদায় মানুষকে অত্যন্ত সহজ সরল জীবন চার্চায় উৎসাহিত করে। কোন রকম জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তার অপছন্দ। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যয়বহুল যে কোন অনুষ্ঠান তার অপছন্দ। ষষ্ঠত, উপধর্মীয় সম্প্রদায় সর্বদাই শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়েছে বিধায় অধিকার বঞ্চিত মানুষের আত্ম প্রতিষ্ঠাই উপ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মৌলিক চেতনা। স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের চেতনা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলনের আবরণে তারা সমাজকাঠামো বিনির্মাণ করে। সপ্তমত, শাস্ত্রীয় ধর্মের প্রতি অসন্তোষ, শাস্ত্রের প্রতি অনীহা, প্রচলিত রীতি-নীতির প্রতি দ্রোহ থাকার পরেও উপধর্মীয় সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এটি সমন্বয়বাদী। এটি একদিকে শাস্ত্রীয় ধর্মের কিছু কিছু বিধি-বিধান মেনে নেয় আবার অন্যদিকে কোন বিষয় বৈষম্যমূলক হলে প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করেনা। তাদের প্রতি যারা বিরূপ তাদেরকেও তারা আহবান জানায় মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য। প্রয়োজন হলে সমন্বয়ের মনোভাব নিয়ে উপ ধর্মীয় সম্প্রদায় লোকমধ্যে লোকাচার পালনের নিয়মে এগিয়ে চলে। 'লোকধর্মীয় সম্প্রদায়: একটি তাত্ত্বিক আলোচনা' থেকে বোঝা যায় সমাজ পরিবর্তনশীল। উল্লেখিত আলোচনার সূত্র ধরে পরবর্তী অধ্যায়ে আমি মতুয়া লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ, বাউল মতবাদ, কর্তাভজা সম্প্রদায়, ব্রাহ্ম আন্দোলন, এবং চার্বাক মতবাদ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা করব। তবে তার আগে পরবর্তী পৃষ্ঠায় ধর্মের মার্ক্সবাদী এবং ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং শাস্ত্রীয় ধর্ম ও লোকধর্মের পার্থক্যের উপর পর পর দু'টি সারণি উপস্থাপন করা হল।

সারণি-১

ধর্মের ক্রিয়াবাদী এবং মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি	মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি
ধর্ম পৃথিবীকে পবিত্র করে	ধর্ম তথাকথিত ক্ষমতা প্রয়োগের হাতিয়ার
ধর্মহীন জীবন উদ্দেশ্যহীন	ধর্ম শোষণের হাতিয়ার
ধর্মীয় চিন্তা বিপদে আপদে প্রশান্তি দেয়	ধর্ম বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস
ধর্ম সামাজিক সংহতি সৃষ্টি করে	ধর্ম জনগণের জন্য আফিম
ধর্ম সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে	ধর্মীয় শিক্ষা এবং আচার অনুষ্ঠান অসাম্যের দর্পণ
ধর্ম মানুষকে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে	ধর্ম সামাজিক বৈষম্যের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়
ধর্মই সমাজ পরিবর্তনের মূল কারণ	ধর্ম সমাজকে স্থবির করে দেয়

উৎস ঃ Anthony Giddens, *Sociology*, UK: Simon Griffiths Polity, 2009.

সারণি-২

শাস্ত্রীয় ধর্ম ও লোকধর্মের পার্থক্য

শাস্ত্রীয় ধর্ম	লোকধর্ম
শাস্ত্রীয় ক্ষেত্রে শাস্ত্রকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শাস্ত্র নির্দেশিত পন্থা ও পদ্ধতি শাস্ত্রীয় ধর্মের আচরিত বিষয় হিসেবে স্বীকৃত।	লোকধর্মের ক্ষেত্রে শাস্ত্র মুখ্য নয়। এমনকি এই সকল ধর্মীয় ধারায় শাস্ত্রকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা যায়।
শাস্ত্রীয় ধর্মে শাস্ত্রের নিয়ম অবশ্য মান্য। শাস্ত্র লিখিত আদেশ নির্দেশকে পরিবর্তন করার অধিকার স্বীকৃত নয়।	লোকধর্মের সাধারণত কোনো লিখিত নিয়ম নেই। গুরুর নির্দেশিত আদেশ নির্দেশ শিষ্যরা অনুসরণ করেন।
শাস্ত্রীয় ধর্মে হোম, যজ্ঞ, নামাজ, রোজা, হজ্ব প্রভৃতি আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। এই ধর্মগুলো সাধারণত অনুষ্ঠান নির্ভর	লোকধর্মে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতাকে বর্জন করা হয়। আনুষ্ঠানিকতা থাকলেও সেটিই মুখ্য বিষয় নয় বা আড়ম্বরের সঙ্গে তেমনটা পালন করা হয় না।
শাস্ত্রীয় ধর্মের ক্ষেত্রে নিজ নিজ ধর্মকেই বড় করে দেখানো হয়। স্ব স্ব ধর্মের বাইরে আর কোনো ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয় না।	লোকধর্ম প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সহনশীল। অন্যান্য ধর্মও এই পরিমণ্ডলে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে।
ধর্মানুসারী ব্যতিত আর কেউই শাস্ত্রীয় ধর্মের ক্রিয়া-করণে অংশগ্রহণ করতে পারে না।	এই সকল ধর্ম ধারায় অন্যান্য ধমানুসারীদেরও প্রবেশাধিকার থাকে।
এই সকল ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো অনুষ্ঠান পৌরহিত্য বা ইমামতির ক্ষেত্রে গুরুর কোনো স্বাধীনতা থাকে না। শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী গুরুকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হয়।	লোকধর্মের ক্ষেত্রে গুরুর যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। এখানে কোনো লিখিত প্রামাণিকতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না বিধায় গুরু অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রিয়া-করণে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।
শাস্ত্রীয় ধর্ম অনুসারীদের মধ্যে ভিন্ন মতাদর্শকে গ্রহণ করে না।	অনেক লোকধর্মের ক্ষেত্রেই ভিন্ন মতাদর্শকেই গ্রহণ করা হয়।
একটি শাস্ত্রীয় ধর্মের মধ্যে বা পাশাপাশি একাধিক লোকধর্মের অস্তিত্ব থাকতে পারে।	একটি লোকধর্মের মধ্যে অন্য কোনো ধর্মের অস্তিত্ব দেখা যায় না।
শাস্ত্রীয় ধর্মে সাধারণত অনুসারীদের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করা হয়।	অধিকাংশ লোকধর্মে সর্বজনীন মাঙ্গলিক চিন্তা বিদ্যমান থাকে।
এই সকল ধর্মীয় ধারার মধ্যে অনুসারীদের কঠোর কঠিন রীতি নীতি অনুসরণ করতে হয়।	লোকধর্মের নিয়ম কানুন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক শিথিল। কঠোর-কঠিন নিয়ম পালন করতে কাউকে বাধ্য করা হয় না।
শাস্ত্রীয় ধর্মে সৃষ্টিকর্তাকে বিস্মৃত হওয়ার অর্থ অন্যায় বলে বিবেচিত হওয়া। শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলো অনুসারীদের ন্যায় অন্যায়বোধের শিক্ষা দেয়।	লোকধর্মগুলো প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তাকে নিজের মধ্যে অনুভব করার তাগিদ দেয়। অনেক ক্ষেত্রে স্রষ্টাকে এই ধর্মে বন্ধু হিসেবে অভিহিত করা হয়।

শাস্ত্রীয় ধর্মে ধর্ম প্রচারক, অবতার, নবী কাউকে ঈশ্বরেরর সঙ্গে তুলনা করা হয় না।	লোকধর্মে অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম প্রবর্তকগণ স্বয়ং ঈশ্বর হিসেবে বিবেচিত হন।
শাস্ত্রীয় ধর্মের মধ্যে ভিন্ন মতবাদকে দমন-পীড়ন করার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়।	লোকধর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী। বিরুদ্ধ বা ভিন্ন মতবাদকে এই ধর্মে সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করে।
স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি থাকে।	এই সব ধর্মের আলাদা কোনো স্বীকৃতি নেই। কোনো না কোনো বড় ধর্মের মধ্যে থেকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে।
শাস্ত্রীয় ধর্মে পাপের ফলে শাস্তির ভয় থাকে।	অনেক লোকধর্মেই পরকালের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না।
প্রতিনিয়ত সর্বজনীন সংহতি আদায়ের চেষ্টা করে।	লোকধর্ম অনেক ক্ষেত্রেই সহনশীল। ধর্মীয় রীতি পালনে কাউকে বাধ্য করেনা।
শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলো জীবন বিধান হিসেবে বিবেচিত হয়।	পূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে কোনো লিখিত প্রমাণ হাজির করে না।
শাস্ত্রীয় ধর্ম কোনো না কোনো লোকধর্মকে আত্তীকরণ করে উৎপত্তি লাভ করেছে। সকল শাস্ত্রীয় ধর্মই পূর্বে এক একটি লোকধর্ম ছিল।	এক একটি লাকধর্ম স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠে।
শাস্ত্রীয় ধর্ম কোনো ভিন্ন সংস্কৃতি বা মতবাদের দ্বারা বাঁধা প্রাপ্ত হলে শক্তি প্রয়োগ করে। ভিন্ন মতবাদকে শক্তি দ্বারা মোকাবেলা অনুসারীদের ক্ষেত্রে পূণ্য বলে বিবেচিত হয়। শাস্ত্রীয় মতাদর্শও এ বিষয়ে অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করে। এমনকি সমবেত শক্তি প্রয়োগ আদর্শ বলে স্বীকার করা হয়।	লোকধর্ম সর্বদা শাস্ত্রীয় ধর্মের চাপে অন্তর্মুখী বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। শাস্ত্রীয় ধর্মের আক্রমণের স্বীকার হয়ে ক্রমান্বয়ে এটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে গ্রাম্য বারোয়ারি তলা, পুরাতন মহিরুহের নিচে, খানকা, আখড়া প্রভৃতি স্থানে নিতান্তই নিভৃতে নির্জনে নিজেদের মতো করে সাধনা চালিয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সংঘর্ষে জড়াতে চায় না॥
শাস্ত্রীয় ধর্মের পুরোহিত, প্রচারক প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রযন্ত্র ও শাসককুলের আনুকুল্যলাভের প্রত্যাশী। শাসকবর্গ শাস্ত্রীয় ধর্মকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে স্বীকার করে নেয়।	অধিকাংশ লোকধর্মের ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা মেলে না। মিললেও তা কোনো না কোনো শাস্ত্রীয় ধর্মের মধ্য থেকে আনুকল্য লাভ করতে চায়।
শাস্ত্রীয় ধর্ম শাস্ত্রাচারের প্রতি অবজ্ঞা কিংবা শাস্ত্রীয় রীতি-নীতির অবমাননা সম্মিলিত জীবনের সংহতির ক্ষেত্রে হুমকি হিসেবে দেখে।	লোকধর্ম অনেক ক্ষেত্রেই নিজস্ব তরিকা অনুযায়ী নিয়ম রীতি পালন করে। কেউ কোনো নিয়ম পালন না করলেও তা জাতীয় এবং সমবেত সংহতির ক্ষেত্রে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।
শাস্ত্রীয় ধর্মগুলো দেশ-কালের গণ্ডি পেরিয়ে যায়।	লোকধর্ম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ।

শাস্ত্রীয় গ্রন্থের নিয়ম-নীতি অমান্যকারীকে শাস্ত্রীয় ধর্ম নিজ অনুশাসনে শাস্তি প্রয়োগ করতে, কখনো বা ভুল স্বীকার ও প্রায়শ্চিত্য করে স্বধর্মে ফিরে আসা যায়।	লোকধর্ম অনুসারীদের শাস্ত্রীয় প্রয়োগের ক্ষেত্র অতটা কঠোর নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ নিজ চেতনা থেকে এবং গুরচন্দ্র নির্দেশ অনুযায়ী নিয়ম কানুন পালন করে।

উৎস ঃ অনুপম হীরা মণ্ডল, †jvKag ‘kb I mgvRZË, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১০, প.৪৭-৪৯।

তথ্যপঞ্জি

১. Anthony Giddens, Sociology, *UK, Simon Griffiths Polity*, 2009, P. 536.

২. রেহনুমা আহমেদ ও মানস চৌধুরী, bvieÁv‡bi c_g cvV, ঢাকা, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০০৩, পৃ. ২৭৪.

৩. রেহনুমা আহমেদ ও মানস চৌধুরী, bvieÁv‡bi c_g cvV, ঢাকা, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০০৩, পৃ. ২৭৪.

৪. Karl Marx and Fedric Engles, *The Communist Manifesto*, London, Electric Book Co. 1848, মোঃ আহসান হাবীব, a‡gi mgvRveÁvb, ঢাকা, গ্রন্থ কুটির, ২০১০।

৫. রেহনুমা আহমেদ ও মানস চৌধুরী, bvieÁv‡bi c_g cvV, ঢাকা, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০০৩, পৃ. ২৩৮.

৬. রেহনুমা আহমেদ ও মানস চৌধুরী, bvieÁv‡bi c_g cvV, ঢাকা, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০০৩, পৃ. ৩৯.

৭. অনুপম হীরা মন্ডল, evsjv‡`‡ki †jvKag : `kb I mgvRZË, ঢাকা, বাংলা একাডেমী; ২০১০, পৃ. ২০।

৮. Emile Durkheim, *The Elementary forms of Relligious Life*, London, Allen and Unwin, 1912.

৯. Max Weber, *The Sociology of Religion*, Boston, MA, Beacon, 1963.

১০. Anthony Giddens, Sociology, *UK, Simon Griffiths Polity*, 2009, P. 578.

১১. অনুপম হীরা মন্ডল, evsjv‡`‡ki †jvKag : `kb I mgvRZË, ঢাকা, বাংলা একাডেমী; ২০১০, পৃ. ৫১।

১২. পল্লব সেনগুপ্ত, †jvKms¯‹…wZi mxgvbv I ¯^iƒc, কলকাতা, পুস্তক বিপনী; ২০০০, পৃ. ৩৩০।

১৩. Max Weber, *The Sociology of Religion*, Boston, MA, Beacon, 1963.

১৪. অনুপম হীরা মন্ডল, evsjv‡`‡ki †jvKag : `kb I mgvRZË, ঢাকা, বাংলা একাডেমী; ২০১০, পৃ. ৫১।

১৫. শ্রী পরিতোষ দাস, mnwRqv I †MŠoxq ˆeòe ag, কলিকাতা, ফার্মা কে, এল, এম প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৮।

১৬. অনুপম হীরা মন্ডল, evsjv‡`‡ki †jvKag : `kb I mgvRZË, ঢাকা, বাংলা একাডেমী; ২০১০, পৃ. ৫১।

১৭. দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত, evsjvi †jvKms¯‹…wZi wek‡Kvl, কলকাতা, আকাদোমি অব ফোকলোর, ২০০৪, পৃ. ৪৪৬-৪৪৭।

১৮. B. Bhushau, *Dictionary of Sociology*, New Delhi, Anmol Publication Pvt. Ltd. 2003, P. 54.

১৯. দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত, evsjvi †jvKms¯‹…wZi wek‡Kvl, কলকাতা, আকাদোমি অব ফোকলোর, ২০০৪, পৃ. ৪৪৬-৪৪৭।

২০. বরচণ কুমার চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত e½xq †jvKms¯‹…wZ †Kvl, কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৪, পৃ. ৪৯৯-৫০১।

২১. আবদুল ওয়াহাব, evsjv‡`‡ki †jvKMxwZ: GKwU mgvRZvwËK Aa¨qb, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৯, পৃ. ১৪।

পঞ্চম অধ্যায়

মতুয়াবাদে লোকধর্মের প্রভাব : একটি পর্যালোচনা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বর্তমান গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো। বর্তমান অধ্যায়ে মতুয়াবাদেঅন্যান্য লোকধর্মের প্রভাব আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হবে তা তাত্ত্বিক কাঠামোর সাথে কিভাবে সংগতিপূর্ণ। বাঙালির লৌকিক জীবন ধারায় মতুয়া লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের (sects) মত আরও আছে সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ, বাউল মতবাদ, কর্তাভজা সম্প্রদায়, ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং চার্বাক মতবাদসহ আরও অনেক বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন। এ সব আন্দোলনকে বিভিন্ন গবেষক ও লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তবে আমি আমার গবেষণায় এ সব সম্প্রদায়কে লোকধর্ম (folk religion) হিসেবেই আলোচনা করার চেষ্টা করব। ধর্মে সনাতন আদর্শে বৈষ্ণব সুফি, বাউল, ব্রাহ্ম, চার্বাক অথবা কর্তাভজা মতবাদের যে বিষয়গুলো মতুয়া লোকধর্মের (folk religion) সাথে সংশ্লিষ্ট আমি মুলত সে সব বিষয় নিয়েই এ অধ্যায়ে আলোকপাত করব। আলোচ্য অধ্যায়ের প্রথম অংশে সুফিবাদ, দ্বিতীয় অংশে বৈষ্ণববাদ, তৃতীয় অংশে বাউল তত্ত্ব, চতুর্থ অংশে কর্তাভজা সম্প্রদায়, পঞ্চম অংশে ব্রাহ্মসমাজ, ষষ্ঠ অংশে চার্বাক মতবাদ এবং সব শেষে মতুয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করব। এক্ষেত্রে মতুয়া সম্প্রদায়ের সাথে সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ, বাউলতত্ত্ব, কর্তাভজা সম্প্রদায়, চার্বাক মতবাদ এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য গুলোর উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

৫.১ সুফিবাদ

যে কোন ধরণের সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে এই উপমহাদেশ এবং বাংলাদেশের শোষিত মানুষ সুফিবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়। সুফিবাদ গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। ১৮২১ সালে Thoulack F.A.G. গ্রীক শব্দ ‘সফিসমা’ (sophisma) থেকে ‘সুফি’ শব্দের প্রচলন ঘটান।[১] প্রকৃত আত্মিক প্রেমের মাধ্যমে যারা স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করতে চায় তারাই সুফি। তাদের দৃষ্টিতে মুর্শিদ বা গুরু ছাড়া আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায় না।[২] এটি হল সুফি মতবাদ উৎপত্তির আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সুফিবাদ বিকাশের মূল কারণ কি আধ্যাত্মিকতাবাদ নাকি এর পিছনে অন্য কোন সামাজিক কারণ নিহিত আছে? এ সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও গোঁড়ামী থেকে বেরিয়ে আসতে বৌদ্ধ সহজিয়ার মত ইসলামী চেতনায় সুফিবাদী ধারণার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। সুফিবাদ হিন্দু তন্ত্র, মন্ত্র এবং সংস্কৃতির বেশ কিছু বিষয়কে অর্ন্তভুক্ত করে। প্রকৃত ইসলামের সাথে সুফিবাদের এটিই প্রধান তফাৎ। এই প্রসঙ্গে ওয়াহাব (২০০৯) এর বক্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে,

> সুফিরা ধনী গরীব এক কাঁতারে দাঁড় করায়, জঙ্গল পরিস্কার করে, হাল চাষ করে, নাচ গানের আসর বসায়, জিকিরের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে নিমগ্ন হয়। সকলে একত্রে সবকিছু মিলে এক উদার আবহ সৃষ্টি হয়।[৩]

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় অন্যান্য লোকধর্মের মত এই অঞ্চলের সংস্কৃতিক ধারায় সুফিবাদ নাচ-গান এবং সংগীতের প্রবেশকারী। তবে ইসলামের ছত্রচ্ছায়ায় যে কোন ধরণের শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে সুফিবাদ একটি প্রতিবাদী আধ্যাত্মিক চেতনা। সুফি চেতনায় এভাবে লোকধর্মের অন্তরালে মানবতাবাদের চর্চা অব্যাহত থাকে। বাংলা ভূখন্ডে জাতিবর্ণ প্রথা যখন সমাজের অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীকে নাজেহাল করছিল তখন এদেশের অন্ত্যজ হিন্দু জনগোষ্ঠী সৌভ্রাতৃত্বের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। বাংলা ভূখন্ড ১২০৫ সালে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের মধ্য

দিয়ে বখতিয়ার খলজির দখলে আসলে সুফি মতবাদের প্রচারক দল সনাতন ধর্মের অনেক আদর্শ ও মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রেখে এই অঞ্চলের মানুষকে ইসলামের পতাকাতলে শামিল করতে থাকে।[৪] সুতরাং বোঝা যায় রাজনৈতিক কারণে এবং নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে সুফিবাদের মত উদারনৈতিক চেতনা এই ভূখন্ডে বিকশিত হয়। এর ফলে সুফিবাদ ধর্মীয় ভাবধারায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনে রূপ নেয়। এই আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের উচ্চবর্গ সৃষ্ট জাতিবর্ণ প্রথায়ও আঘাত আসে। সুফিবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই অঞ্চলের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হয় আরও অনেক লৌকিক চেতনা বা লোকধর্ম। এই প্রসঙ্গে রায় (২০১১) এর বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন,

> সুফিরা জীবন ও লোকসংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলে, যেমন, পীরের ধ্যান, পীরের পূজা, গোরপূজা এসব সুফি প্রভাবের ফল। বিভিন্ন শ্রেণীর লৌকিক পীর, লোক সংগীত, পালাগান, ছড়া, লোকবিশ্বাস, প্রবাদ, কিংবদন্তী ব্রতকথা রচনা এবং শিরণী মানত, দরগাহ পূজা, ওরশ পালন প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত।[৫]

উল্লেখিত প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় সুফিবাদও এদেশের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ধারা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারে নি। এটি বর্ণবাদ থেকেও পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। এই বিষয়টি অবশ্য মানবতাবাদী চেতনার পরিপন্থী। এটি সুফিবাদের দুর্বল দিকও বটে। তবে জাতিবর্ণ প্রথা থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করতে সুফিবাদের প্রয়াসও যে নেই সে কথা বলা যাবে না। কারণ সুফিবাদী চেতনায় প্রেম, প্রীতি, সৌহার্দ্যের পরিবেশ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে পরচর্চা, পরনিন্দা থেকে বেরিয়ে আসবার আকুতি। এই কারণে সুফিবাদে আত্ম-সমালোচনা, আত্মসংশোধন, আমিত্ব বর্জনের প্রয়াসকে ইতিবাচক মনোভাবে দেখা হয়। সুফিরা মানুষে মানুষে বিভেদ ভুলে সাম্যের চেতনায় মানুষকে উজ্জীবিত করে। সামাজিকভাবে সহমর্মিতা প্রকাশ করে সমাজের নির্যাতিত, নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীকে। যারা পূজা অর্চনায় নিষিদ্ধ ছিল তারা সকল প্রকার নিপীড়ন থেকে বাঁচতে ইসলামী মূল্যবোধের ভাবধারায় সুফি মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে।[৬]

একথা বলা সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হবে না যে, যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইউরোপে যেমন ধর্মসংস্কার আন্দোলন সূচিত হয়েছিল, বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষে তেমনি শাসক, পুরোহিত, ব্রাহ্মণের চরম অন্যায়ের জবাব দিতে সুফি চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। সুফিবাদের ধারাবাহিকতায় এই উপমাহাদেশে বৈষ্ণব আন্দোলন সুস্পষ্ট রূপরেখা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় নানা কিংবদন্তীর মাধ্যমে এই বাংলা ভূখন্ডে বাউল মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে। তবে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সব কিছু সাধারণের পক্ষে পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। এক দিকে শাস্ত্রীয় তন্ত্র, মন্ত্র এবং বৌদ্ধ সহজিয়াদের যোগাভ্যাস রপ্ত করে সুফি মতাবলম্বীরা, অন্যদিকে ইসলামি চেতনায়ও উজ্জিবিত হয়।[৭]

সরকার (১৯৯৯) এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধারণা করা যায় যে, বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মূল সংস্কৃতি থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার কোন মন-মানসিকতা সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল না। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এ অঞ্চলের মানুষের হাজার বছরের লালিত সংস্কৃতির সাথে ইসলামী সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁ (reinaisas) এবং ভারতবর্ষের বর্ণবাদ বিরোধী সামাজিক আন্দোলন তাত্ত্বিকভাবে অভিন্ন। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব যেমন পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত হওয়ার পথ প্রশস্ত করে, একই ভাবে এ ভূখন্ডে ১৫১টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বা

বা লোকধর্মের (sects) সৃষ্টি হয়। মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা ও শোষণের জবাব দিতে বাংলাদেশে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬।[৮] এগুলো প্রত্যেকটিই সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে বৈষম্যবাদ দূরীকরণে ভূমিকা পালন করে। এদের প্রত্যেকটিরই অবস্থান ছিল প্রচলিত সমাজের বৈষম্যযুক্ত প্রথা ও লোকাচারের বিরুদ্ধে।

সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচার যাই হোক, ব্রাহ্মণ্যবাদী চেতনায় যে বৈষম্য ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে ভারতীয় উপদেশে বৌদ্ধ মতবাদ, জৈন মতবাদ সম্প্রসারিত হয়। খ্রিষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতক থেকে এরই ধারাবাহিকতায় এই অঞ্চলে সুফিবাদ বিকশিত হয়। সুতরাং বলা যায় সুফিবাদ কেবলমাত্র ইসলামের প্রচার ছিল না, এটি ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথায় যে বর্ণ বৈষম্য ছিল তারই ধারাবাহিক এক প্রতিবাদ যা ইসলামী ঘরানা থেকে উদ্ভুত। এই প্রসঙ্গে ইসলাম (২০০৮) এর বক্তব্য অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশের সুফি সমাজ খাঁটি মানবপ্রেমিক। মানুষে মানুষে বিভাজন সুফি চেতনার পরিপন্থী। তাদের চেতনায় লালিত হত অসাম্প্রদায়িক চেতনা। কারণ তারা বিশ্বাস করে মানুষ মাত্রই জন্মসূত্রে এক ও অভিন্ন। মৃত মানুষের যেমন জাত পরিচয় থাকেনা তেমনি জাতের চিহ্ন থাকেনা কোনো নবজাতকেরও। এই কারণে বিভেদের পরিবর্তে সম্প্রীতি আর ঐক্য প্রত্যাশা করে সুফি সম্প্রদায়।[৯]

এই ধরণের মন্তব্য থেকে বোঝা যায় সুফিবাদের মূল কথা হলো বর্ণবৈষম্যহীন, শ্রেণিহীন, শোষণহীন এবং বঞ্চনামুক্ত এক সাম্যবাদী ও উদারনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সাথে এই জায়গাটাতে সুফিচেতনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ এবং বর্তমান বাংলাদেশে চৈতন্য যুগে (১৪৮৬-১৫৩৩) যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন সফলতা অর্জন করেছিল সেখানেও সুফিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। তবে এই সব কিছুর অনুপ্রেরণায় ইউরোপীয় রেনেসাঁর ভূমিকা কম ছিল না। ভারতবর্ষের সংস্কার আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মযাজক ও পুরোহিতের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের বিরুদ্ধে। এই জায়গাটাতে আন্দোলন বেগবান করতে সুফি মতবাদ মানুষের চেতনায় টনিকের (tonic) ন্যায় কাজ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভূখন্ডে যত উপ-ধর্মীয় বা লোকধর্মীয় সম্প্রদায় (sects) আত্ম প্রকাশ করেছিল সবারই চেতনা সুফিবাদ দ্বারা শাণিত। এ ধারাবাহিকতায় পরবর্তী অংশে আমি বৈষ্ণববাদ নিয়ে আলোচনা করব।

৫.২ বৈষ্ণববাদ

সুফিবাদের মত বৈষ্ণববাদও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত। জাতিভেদ, বর্ণভেদসহ সব রকম নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছিল বৈষ্ণব আন্দোলন। হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ী চিন্তা, মুক্তবুদ্ধি ও মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত বৈষ্ণব চেতনা। এই চেতনায় মানুষই আসল। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি একটি লোকধর্ম বা উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় (sects)। এটি লোকসংস্কৃতির একটি মানবতাবাদী উপাদান। এই উপাদান উৎপত্তি হয় সুফি দর্শনের অনুপ্রেরণায় ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার স্থবির রীতি অনুযায়ী যারা অন্ত্যজ গোষ্ঠীভুক্ত তারা মন্দির এবং মন্দিরে রক্ষিত দেবতাকে খুশি করা ও পূজা করার অযোগ্য। এক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে তথাকথিত সনাতন নীতি-নির্ধারকদের অভিমত হলো এতে উপাস্য মন্দির এবং দেবতার অকল্যাণ হয়।[১০] এই বক্তব্য থেকে ধারণা করা যায় সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং সামাজিক বৈষম্যের মূল কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। সামাজিক নিপীড়নের মৌলিক কারণ সনাতন

ধর্মের অপব্যবহার। ধর্মের নামে, জাতি বর্ণের দোহাই দিয়ে সে সময় উচ্চবর্গের লোকেরা সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। সমাজে তৈরী হয় সামাজিক বৈষম্যের পরিবেশ। অস্পৃশ্যতার গ্লানি নিয়ে সমাজের খেঁটে খাওয়া মানুষেরা অমানবিক জীবন যাপন করে।

সমাজের এরূপ পরিস্থিতিতে উদারনৈতিক ও মানবিক গুণের সাহায্যে শ্রী চৈতন্য সামাজিক বৈষম্য নির্মূলে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১১] প্রবর্তন করেছিলেন বৈষ্ণব ধর্ম। এখানে মানুষ ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর উপাসনা করা হত না। ধর্মের নামে কল্পিত দেবদেবীর উপাসনা তিনি বন্ধ করেছিলেন। মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছিল বৈষ্ণববাদ। এটিকে বলা যায় ভারত বর্ষের ধর্মসংস্কার আন্দোলন। এটি ছিল সমাজে ব্যক্তিস্বার্থে সংকীর্ণ মনোভাবে ধর্ম ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ধর্ম যুদ্ধ। ধর্মীয় আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে বৈষ্ণববাদকে ইউরোপের Protestant আন্দোলনের সাথে তুলনা করা যায়।[১২] কারণ ল্যাটিন আমেরিকার সামাজিক আন্দোলন বা প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের মত বৈষ্ণববাদ ছিল সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত মানুষের মুক্তি সংগ্রাম। এটি ছিল এই উপমহাদেশের নির্যাতিত, অবহেলিত মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে এটি ছিল এক তীব্র প্রতিবাদ। ডোম, ডালি, মুচি, হাড়ি, জেলে, কলু, যবন সকলেই সম অধিকার নিয়ে সমাজে বসবাস করবে। এটিই ছিল বৈষ্ণবীয় চেতনা।[১৩]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় বৈষ্ণববাদের মাধ্যমে সমাজের নিপীড়িত শ্রেণি পেয়েছিল একটি সুনির্দিষ্ট নিষ্কন্টক গন্তব্যে চলার দিক নির্দেশনা। সমাজের সকল অন্ত্যজ শ্রেণি অর্জন করেছিল জীবন চলার সহজ ঠিকানা। সামাজিক অসমতা দূরীকরণে বৈষ্ণবীয় চেতনা ছিল মূল মন্ত্র। মাত্র আটটি সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলা থেকে শ্রী চৈতন্য ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণ সৃষ্ট জাতিবর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষকে সাম্যের চেতনায় উজ্জীবিত করা। হিংসা, বিদ্বেষ ভুলে মানুষকে ধর্ম নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।[১৪]

ব্যাপক অর্থে বলা চলে বৈষ্ণব আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে মানব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা। এই কারণে পুরোহিত শ্রেণি তাদের স্ব স্বার্থে হিন্দু ধর্মে যে অজস্র দেবদেবী ও উপদেবতা আবিস্কার করেছিল তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলন। এ জন্যই জাত-পাত এবং নারী-পুরুষ বৈষম্য ঘুচিয়ে মানুষই ঈশ্বর এমন চেতনা ধারণ করেছিল। হৃদয়ে ধারণ করেছিল বাঙালীর আবহমান সুফি-বৌদ্ধ-সহজিয়া চেতনা। মানবসৃষ্ট সামাজিক স্তরায়নে (social stratification) আঘাত করাই ছিল বৈষ্ণবীয় আদর্শের মৌলিক লক্ষ্য। এ কারণে মুসলমান হওয়ার পরেও বৈষ্ণব ভুক্ত হয়ে মুসলমান সমাজের অনেকেই তাকে গুরু বা মুর্শিদ জ্ঞানে মান্য করেছে। কারণ তিনি সবার উপরে স্থান দিয়েছেন মানুষকে।[১৫] চণ্ডী দাসের ভাষায় এটি হল সবার উপরে মানুষ সত্য। বৈষ্ণবমতে সংসার জীবন গুরচত্ব পায়নি। মানব প্রজাতি সৃষ্টি তত্ত্বেও তাদের বিশ্বাস ছিল না। সাংগঠনিক এ দূর্বলতা অন্য লোকধর্ম প্রকাশের সুযোগ এনে দেয়।

তবে এটি পরিষ্কার যে, বৈষ্ণববাদ সনাতন ধর্মের নির্যাতিত নিপীড়িত, লাঞ্ছিত গণমানুষের ত্রাণকর্তা রূপে আবির্ভূত। ব্রাহ্মণ্যবাদের বাইরে এসে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করাই বৈষ্ণববাদের মূলকথা। ব্রাহ্মণ্যবাদের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পেতে বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। বিদেশী শাসন শোষণের করালগ্রাস আর এই দেশীয় সনাতন ধর্মব্যবসায়ীর হাত থেকে বাঙালী জাতিকে মুক্ত করতে শ্রী চৈতন্য ছিলেন মহৎ হৃদয়ের এক সমাজহিতৈষী সমাজ সংস্কারক। উঁচু-নীচু আর সিলসিলায় বিভক্ত মানব জাতি যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে সে ব্যাপারে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই কারণে একথা বলা যুক্তিযুক্ত যে, শোষিতের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ছিল বৈষ্ণব আন্দোলন। এটি ছিল তথাকথিত লোকাচার ও শাস্ত্রভারমুক্ত এক আদর্শ সমাজ গঠনের সংগ্রাম। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বেদ বিধির বাইরে তিনি (শ্রী চৈতন্য) মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে সংগ্রাম করেছিলেন। পনের শতকে শ্রী চৈতন্য বৈষ্ণব আন্দোলনের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহর শাসন ব্যবস্থা বৈষ্ণবমতের অনুকুলে থাকায় বৈষ্ণব দর্শন প্রচারে শ্রী চৈতন্যকে কোনো রূপ সমস্যায় পড়তে হয়নি। তাই এটি ছিল একদিকে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন অন্যদিকে সমাজ সংস্কারকের প্রতীক।[১৬] বৈষ্ণব আন্দোলনের চেতনায় পরবর্তীতে সুফি, বৈষ্ণব, বাউলের বাইরেও অনেক লোকধর্ম জন্ম নেয়।

এ ধরণের বক্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এই বাংলায় পনের শতকে চৈতন্যদেব সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের মূল্যবান উপাদান যুগিয়েছিলেন। সাম্যবাদী চেতনা দিয়ে তিনি মানুষে মানুষে যে ব্যবধান সেটা দূর করবার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এটি ছিল হীন বংশোদ্ভুত, নিরক্ষর এবং অবাঞ্চিত মানুষের প্রতি তাঁর সর্বোত্তম সহানুভূতি। তাঁর দৃষ্টিতে যাগ, যজ্ঞ, স্তুতি সবই হবে মানবকল্যাণে। তিনি মনে করতেন বৈষ্ণবচেতনায় মানুষই ঈশ্বর, মানবসেবায় এবং ভালোবাসায় প্রকৃত শান্তি নিহিত। জাতিভেদ, বর্ণভেদ নির্মূল করে অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠন করা মানুষে মানুষে বৈষম্য রেখে কখনই সম্ভব নয়।[১৭]

করীম (১৯৭১) এর এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় বৈষ্ণবতত্ত্ব মানুষে মানুষে হানাহানি, অর্থ-বিত্তের কামড়াকামড়িমুক্ত শোষণহীন সমাজ নির্মাণে মানুষকে উজ্জীবিত করে। এই তথ্য থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, জাতিভেদ, কর্মফল, ধনী দরিদ্রের ব্যাখ্যা এবং রাজশক্তিতে ঐশী ক্ষমতা সম্পর্কে রাষ্ট্রের যে ব্যাখ্যা সে জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শ্রী চৈতন্যের নেতৃত্বে বৈষ্ণব আন্দোলন ছিল যুগের চাহিদা। এই কথা সত্য যে জ্ঞান বিজ্ঞানে ভারত ছিল বস্তুবাদী। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং এদেশীয় যাজক এবং পুরোহিতেরা নানা কৌশলে এদেশের মানুষকে নগরের বদলে গ্রাম গড়তে বাধ্য করে। তবে চেতনায় যেহেতু মানবতাবাদ, সাম্যবাদ অথবা বস্তুবাদ সেহেতু শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলনের সাথে বাংলার লোকসমাজ একাত্ম হয়েছিল। অন্যান্য উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় (sects) অথবা লোকধর্মের ন্যায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও বস্তুবাদে বিশ্বাসী।[১৮] নানা তথ্য প্রমাণে বোঝা যায় বৈষ্ণব মতবাদের অনুকরণে বাংলায় বিদ্যমান অন্যান্য লোকধর্ম বিকশিত হয়েছে বস্তুবাদী দার্শনিক চেতনায়।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধারণা পাওয়া যায় যে, বৈষ্ণব চেতনা অনুমানে বিশ্বাস করেনা, বিশ্বাস করে বর্তমানে। সুফি প্রভাবিত বৈষ্ণব উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় (sects) ব্রাহ্মণ্যবাদের শাস্ত্রবিরোধী কপট আচরণ প্রত্যক্ষ করেছে। সুতরাং বৈষ্ণববাদ উপমহাদেশ তথা এই অঞ্চলের মানুষের জন্য অত্যন্ত অহংকারের। সুফি সম্প্রদায় যেমন অসাম্প্রদায়িক

চেতনা দিয়ে লোকধর্মকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি বৈষ্ণবের কীর্তন গান আমাদের লোকধর্মের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের বহমান সংস্কৃতিকে উন্নত করেছে। বৈষ্ণববাদ শাস্ত্রীয় ধর্ম প্রত্যাখ্যান করে সাম্যবাদী চেতনা লালন ও চর্চা করে। এই ধরণের উপ-ধর্মীয় চেতনা বাউলতত্ত্বও বিদ্যমান। পরবর্তী অংশে (section) এই বিষয়ে বিষদ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে।

৫.৩ বাউল মতবাদ

বাঙালি সমাজে দেহতত্ত্ব সাধনে 'বাউল' শব্দটি অতি পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বাউল শব্দটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। বায়ু+ল= বায়ুল বিবর্তিত হয়ে বাউল রূপ ধারণ করেছে বলে অনেকের অভিমত। বাউল শব্দের উৎপত্তি নিয়ে যে কথাই বলা হোক না কেন আসল বক্তব্য হলো সুফিবাদ ও বৈষ্ণববাদের মত বাউল মতবাদও শাস্ত্রীয় ধর্মের সব রকম বৈষম্যমূলক আচরণ প্রত্যাখ্যান করে সমন্বয়বাদী চেতনা লালন করে। সুফিচেতনা আর বৈষ্ণব চেতনার যৌথ মিলনে তৈরী হয়েছে বাউল মতবাদ। বাউল সম্প্রদায় এক দিকে ছিল সব রকম ইসলামী অনাচারের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের জাতিবর্ণ প্রথাও তারা মেনে নেয়নি। বাউল মাত্রই তাদের গানের ভাষায় সাম্যের চর্চা করেছে। এই কারণে বাউল একটি মানবতাবাদী মতবাদ। দরগা, ভুত, প্রেত ইত্যাদিতে বাউল বিশ্বাস করে না। মানব সেবার বাইরে এরা অন্য কিছুতে স্রষ্টার সাধনা খুঁজে পায়না; বস্তুর অস্তিত্বেই এরা বিশ্বাসী। তাই এরা বস্তুবাদী। বাউলের বস্তুবাদ একটি ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা। আধ্যাত্মিকতার আবরণে এরা গুরুবাদী। বস্তুবাদের নিরীখে এরা মানুষ গুরুকে ভজনা করে। মানুষকে গুরু জ্ঞানে এবং ঈশ্বর জ্ঞানে বাউলেরা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনে বসায়।[১৯] সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা অঞ্চলে সর্ব প্রথম বাউল চেতনা বিকশিত হয়। বাউলকে উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় (sects) বা লোকধর্মও (folk community) বলা হচ্ছে। কারণ, লোকসমাজ থেকেই মানবতার বাণী নিয়ে বাউল শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে। শ্রী চৈতন্যের অনু অবতার আউল চাঁদ হলেন বাউল মতবাদের জনক। বৌদ্ধ, সুফি এবং বৈষ্ণব চেতনার চূড়ান্তরূপ বাউলতত্ত্ব। বাউলের গান, বাউলের সাধনা আজ লোকধর্মের অবিচ্ছেদ্য উপাদান।[২০]

জন মনে এই প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক যে কেন এবং কোন কারণে উপমহাদেশের বাঙালী অধ্যুষিত এ অঞ্চলে সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ, বাউলতত্ত্ব, কর্তাভজা সম্প্রদায় এবং মতুয়া সম্প্রদায় লোকধর্মের অবিচ্ছেদ্য উপাদান বা উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (sects) মর্যাদা লাভ করল। কোন কারণে এ সকল চেতনা ইহবাদী হয়ে গেল? কেনই বা প্রচলিত সমাজ তাদেরকে পাগল অথবা উম্মাদ বলে ভর্ৎসনা করছে? এসব জিজ্ঞাসার জবাবে বলা যায় সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাউলেরা ছিল সোচ্চার। বর্ণবাদ আশ্রিত শাস্ত্র শাসন এরা মানেনি; তাই এরা শাস্ত্র বিরোধী। এ কারণে বাউল ফকির লালন শাহ বলেছেন, মৃত্যুর পরে গুরুর দেখা মিলবে কিনা সেটি অপেক্ষা ইহজীবনে ভালো থাকাটাই আসল কথা।[২১] এটি আবার চার্বাক দর্শনের সাথে মিলে যায়। এটির সাদৃশ্য পাওয়া যায় ব্রাহ্ম ধর্মের আদর্শের সাথেও।

সুতরাং বোঝা যায় বাউল মাত্রই মানব মুক্তির কথা বলেছেন। তথাকথিত শাস্ত্রীয় ধর্মাচার থেকে নিপীড়িত মানুষকে রক্ষা করতে তারা আত্মোৎসর্গ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এই কারণে বলা যায় তারা কেবল ধর্মসংস্কার আন্দোলনই করেনি, তাদের অবস্থান ছিল ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী অথবা বাংলায় নীল চাষের বিরুদ্ধে। সামন্তবাদ রুখতে, বেপরোয়া পুঁজিবাদ থামাতে অথবা বর্ণবাদের করাল গ্রাস থেকে বাঙালী জাতিকে মুক্তি দিতে বাউলেরা ছিল সাহসী অথচ

সমন্বয়বাদী। শরীফ (২০০৩) এ যুক্তি সমর্থন করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেছেন, সকল শ্রেণির বাউলের মূল নেতা হলেন আউল চাঁদ।[২২] চক্রবর্তী (২০০৫) এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে স্পষ্টত বলেছেন সকল বাউলের নেতা আউল চাঁদ।[২৩] প্রচার প্রসারেও এই তথ্যের সত্যতা মেলে।

বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় বেদ, পরলোক, জাতিভেদ বা ব্রাহ্মণ্যবাদ নিয়ে সমাজ মানসে যখন মুক্তির বাসনা সৃষ্টি হয়েছিল তখন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বাউল ঘরাণার অনেক লোককবি, লোকশিল্পী এবং লোকধর্ম আত্মপ্রকাশ করেছিল। সমাজের চরম দুরবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে আবির্ভূত হলো দুদ্দুশাহ, পাঞ্জুশাহ, শাহ আব্দুল করীমের মত জগদ্বিখ্যাত বাউল। শাস্ত্রীয় ধর্মের অনাচার, ধর্মের নামে অমানুষিক নির্যাতনের প্রতিবাদে তাদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো সংগ্রামী সংগীত। এই প্রসঙ্গে বাউল কবি পাঞ্জু-শাহের একটি গান ওয়াহাব (২০০৯) এর উপস্থাপনায় তুলে ধরা হলো। তিনি বলেছেন-

এ জেতের[২] বোঝা লয়ে মিছে মলাম বয়ে।
চিরকাল কাটালাম আমি মানী মানুষ হয়ে,
মনের গৌরব কুলের গৌরব ধন্ধবাজী সব দেখি ॥
লোক পেটের জ্বালায় দেশান্তরী হয়,
হিন্দু মুসলমানের বোঝা মাথায় করে বয়,
কারবা জাতি কেবা দেখে ঘরে এলে চিহ্ন কি ॥[২৪]

বাউল পাঞ্জু-শাহের এই বক্তব্যে শাস্ত্রীয় ধর্ম, ব্রাহ্মণ্যবাদ, জাতিবর্ণ প্রথার নামে মানুষ নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে আরও বোঝা যায় আবহমান বাংলা চিরকালই অসাম্প্রদায়িক চেতনার পৃষ্ঠপোষক। এখানে জাত বিচারের কোন দাম নেই। কিন্তু শাস্ত্রকার, বুর্জোয়া শাসক এবং বিদেশী সুবিধা প্রত্যাশী মহল কুটকৌশলে সে চেতনায় ফাটল ধরিয়েছে বারবার। জাতবিচারের দোহাই দিয়ে তারা লোকসমাজের মানুষকে নানাভাবে হয়রানী করেছে। তাদের সে প্রহসনমূলক আচরণের জবাব দিতে বাউল কবিরা প্রতিবাদী অসংখ্য গান রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে পাগলা কানাইয়ের গানের কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে-

কেউ বলে দুর্গা হরি,
কেউ বলে বিসমিল্লা আখেরি
তবু পানি খেতে যায়
এক দরিয়ায়।[২৫]

উল্লিখিত এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় শাস্ত্রীয় ধর্মে হিন্দু সম্প্রদায় দাবী করছে দেবী দুর্গার আরাধনায় স্বয়ং স্রষ্টার সন্ধান পাওয়া যাবে। অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায় আল্লাহ নামের স্মরণে পরকাল প্রাপ্তির কথা বলছে। এই সবই অনুমান, এই সবই তথাকথিত জাতবিচার। বাউলের অভিমত জাত হাতে ধরা গেলে তা আগুনে পোড়াতাম। প্রয়োজনে সবাই একই পুকরে বা একই জলাশয়ে গোসল করে, একই ময়রার[৩] মিষ্টান্ন দিয়ে হিন্দু পূজা করে, মুসলমান দেয় মিলাদ। কিন্তু বাউল চেতনা, লোকধর্মীয় চেতনা বলে অন্য কথা। তারা বলে মানুষ জন্ম সূত্রে অসাম্প্রদায়িক এবং সাম্যবাদী চেতনার দাবীদার। সুতরাং এখানে মানবসৃষ্ট বৈষম্যের কোন দাম নেই। এই প্রসঙ্গে বাউল কবি দুদ্দুশাহের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন-

যে বস্তু জীবনের কারণ
তাই বাউল করে সাধন।[২৬]

২। জেত শব্দের অর্থ দিয়ে জাতি বুঝানো হয়েছে।
৩। ময়রা বলতে যারা দুধের মিষ্টান্ন তৈরী করে তাদের বুঝানো হয়।

আলোচ্য বক্তব্য থেকে এটি পরিস্কার বোঝা যায় বাউলের গানে শ্রেণি চেতনা রয়েছে। কারণ সনাতন হিন্দু সম্প্রদায় যখন ব্রাক্ষ্মণ্যবাদের ফাঁদে পড়ে নাভিশ্বাস ফেলছে, নিম্নবর্ণের হিন্দু জনগোষ্ঠী যখন মুক্তির আকাঙ্খায় ব্যস্ত, মুসলমান সমাজের শাস্ত্রাচারে মানুষ যখন অতিষ্ঠ ঠিক তখনই মানব ধর্মের উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে হাজির হয় বাউল সম্প্রদায় নামক লোকধর্ম। সমাজ জীবনে জাত পাত এবং ধর্মের নামে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিবাদ গ্রামের বাউল কবিরা সংগীতের মাধ্যমে করেছিল। বাউল সম্প্রদায়ের ধারণা হয়েছিল তথাকথিত ধর্মীয় আচরণ ধর্মের সীমা পেরিয়ে পৃথিবীর সব সমাজকে আক্রমণ করতে পারে। আজকের বিশ্ব বাস্তবতা তার প্রমাণ দেয়। এই আক্রমণ থেকে হিন্দু মুসলমান কেহই বাদ যাচ্ছে না। ধর্মীয় শোষণের পাশাপাশি ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর শোষণ, সামন্ততন্ত্রের নিস্পেষণ সাধারণ মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস তুলেছিল। এই ব্যাপারে বাংলার বাউল সমাজ সোচ্চার হয়েছিল।[২৭] এমন মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায় বাউল সম্প্রদায় গণ মানুষের আকাঙ্খার প্রতিনিধি হয়ে সব সময় সাধারণ মানুষের নির্যাতনের কারণ খুঁজে ফিরেছেন। এই কারণে তথাকথিত লোকাচারের বিরুদ্ধে লোক সংগীত রচনা করে তারা বে-শরা ফকির নামে আখ্যায়িত হয়েছে।[২৮] অনেক সময় আক্রান্ত হয়েছে শারীরিকভাবে। রাষ্ট্র যন্ত্র সব সময় তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। কায়েমী স্বার্থে শাসক গোষ্ঠী মাঝে মাঝে তাদের কাছে টানলেও তাতে শেষ রক্ষা হয় নি। পরবর্তীতে প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা তারা আরও বেশী আক্রান্ত হয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুমান করা যায় যে, তথাকথিত সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল বাউল সমাজ। এই কারণে তথাকথিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি কর্তৃক তারা সমালোচিত হয়। সবার উর্ধ্বে মাটি ও মানুষকে স্থান দেয়াটাই দোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাউলদের জন্য। যতদূর জানা যায় যে ব্যক্তি প্রচলিত ধর্ম পালন করে না, অথচ ভালো পণ্ডিত সে-ও বাউলদের কাছে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসার পাত্র। বাউল ঘরানার যত সম্প্রদায় সবাই মনে করে জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং ধর্মের নামে কুপমন্ডুকতা সবই কায়েমী স্বার্থের সাথে জড়িত। এই সবই রাজনীতিক, সমাজসেবক ও ধর্মব্যবসায়ীদের কারসাজী।[২৯] এই জায়গাটির সাথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, চার্বাক দর্শন অথবা ল্যাটিন আমেরিকার সামাজিক আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।

এই ধরণের বক্তব্যে এটি পরিস্কার যে বাউল সম্প্রদায়ের আন্দোলন, সংগ্রাম অথবা সংগীত সৃষ্টি হয় মুলত মানবসৃষ্ট বৈষম্যের প্রতিবাদ জানাতে। মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, প্যাগোডা, ধর্মীয় বিধিবিধান যখন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহৃত হয় তখন বাউল এবং তার আদর্শ অনুপ্রানিত মানুষেরা ব্যথিত হয়। যুক্তির আলোকে বলতে হয় এরূপ ব্যথার সমষ্টিক রূপ হচ্ছে আজকের বাউল সম্প্রদায় যা লোকধর্মের লিজেন্ড। সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বাউল সম্রাট লালন তাই বলেছেন-

হাতে পেলে জাত
পোড়াতম আগুন দিয়ে।[৩০]

লালন ফকিরের এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে সমাজ শোষণের বিরুদ্ধে এক জোরালো প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ ধর্মীয় কুপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে, এই প্রতিবাদ বর্ণবাদের বিরুদ্ধে, এই প্রতিবাদ ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। ধর্মীয় উপাসনালয় কোন বিশেষ মহলের নয়, এটি সবার, এটি সর্বকালের। বাউলরা মনে করে মন্দির মসজিদ রয়েছে এই অন্তরে।[৩১]

মানুষ বাদে স্রষ্টা ভজনে তারা বিশ্বাসী নয়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাউল দর্শনে আপ্লুত হয়ে তাদের সাহিত্য প্রতিভায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধারণা করা যায় শাস্ত্রীয় ধর্মের উপসনালয় অপেক্ষা অন্তরের উপাসণালয় অনেক বেশী কার্যকর। মনের ভাব প্রকাশের সহজ মাধ্যম সংগীত। হাজার বছর ধরে বাঙালীর সংগীতপ্রিয়তাকে মানব কল্যাণে কাজে লাগিয়েছে বাংলার বাউল সম্প্রদায়। একতারা আর সংগীত নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে শোষিত নির্যাতিতের। মার্কসবাদ, বস্তুবাদ, সাম্যবাদ দ্বারা সজ্জিত হয়েছে বাউল গান। তবে মার্কসের জন্মের আগেই বাংলায় বস্তুবাদী বাউল দর্শন আত্ম প্রকাশ করে। বাউলতত্ত্বে বস্তুবাদের উপস্থিতি প্রবল; বাউল সম্রাট লালন এই কারণে বলেছেন তিনি বস্তুভিখারী। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, মৃত্যুর পরে স্রষ্টার দেখা পাব সে তো কথার কথা মাত্র।[৩২] বাস্তবের ঈশ্বর মানুষের দেখা পাওয়া এবং তাকে ভক্তি ভরে কাছে টানায় তারা প্রবলভাবে বিশ্বাসী।

সুতরাং বোঝা যায় বাউলতত্ত্বে বস্তুবাদী চেতনা, সাম্যবাদী চেতনার উপস্থিতি রয়েছে। সমাজে যখন অনাচার তীব্র আকার ধারণ করে তখন সমাজের বিবেক অন্বেষণ করে মানব মুক্তির উপায়। এমতাবস্থায় বৌদ্ধ সহজিয়া, সুফি-বৈষ্ণবের প্রভাবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করে বাউল ঘরানার দেড়শতাধিক লোকধর্ম যারা গুরুবাদী এবং মানুষভজা হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। তাদের সবারই উদ্দেশ্য ছিল লোকধর্মের বাণী নিয়ে শোষণ মুক্ত আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। বর্ণ বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি ছিল এক মাইল ফলক। এই মাইল ফলকের সাথে যুক্ত আরেকটি নাম কর্তাভজা আন্দোলন। সামাজিক আন্দোলনের অংশীদার এই লোকধর্ম বা উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে পরবর্তী অংশে বিশ্লেষণ করা হলো।

৫.৪ কর্তাভজা সম্প্রদায়

বাঙালী সমাজে প্রচলিত উগ্র বর্ণবাদ, জাতিভেদ এবং সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনা নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করে কর্তাভজা সম্প্রদায়। ভারতের পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলা এই সম্প্রদায়ের উৎস ভূমি। কুষ্টিয়া জেলা পূর্বে নদীয়া জেলার একটি মহকুমা ছিল। এই সূত্রে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, মাগুরা, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, সিলেট, বিক্রমপুর অঞ্চলে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর চব্বিশ পরগণা, বীরভূম, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা এবং মধ্যপ্রাচ্যে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বসতি রয়েছে বলে জানা যায়।[৩৩] তবে ধর্মীয় পরিচয়ে রাষ্ট্র স্বীকৃত মূল ধারার কারণে এদের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। কেননা বাউল অথবা লোকধর্মসহ অন্য যে নামেই এরা পরিচিত থাকুক ধর্মীয়ভাবে রাষ্ট্রের কাছে এরা হিন্দু অথবা মুসলমান হিসেবে তালিকাভুক্ত। সর্ব সাধারণের কাছে এই সম্প্রদায়ীরা হিন্দু, মুসলমান অথবা রাষ্ট্রস্বীকৃত অন্য যে কোন ধর্মের সদস্য হিসেবে পরিচয় দেয়।[৩৪] মূলত বিড়ম্বনা এড়ানোর জন্য তারা এই কাজটি করে। তবে নিজের এলাকা এবং গোত্রীয় সদস্যদের কাছে এরা কর্তাভজা নামে পরিচিত।

কারো কারো মতে, বৈষ্ণব আন্দোলনের শাখা সংগঠন হিসেবে কর্তাভজা সম্প্রদায় আউল চাঁদের (১৬৯৪-১৭৬৯) নেতৃত্বে বিকশিত হলে সর্ব প্রথম হটুঘোষ দীক্ষা নেয়। এরপর রামসরণ পাল, সতীমাসহ আরও ২২ জন দীক্ষিত

হয়।[৩৫] কর্তাভজা মানে জগতের যিনি মালিক তার সাধন ভজন করা। কর্তাভজারা মনে করে দেহ হচ্ছে স্রষ্টা বা মালিকের সম্পত্তি। এই সমপত্তিতে পরমাত্মা রূপে স্বয়ং মালিক বসবাস করেন এবং এর বিনিময়ে তাকে কর বা খাজনা দিতে হয়। যারা এভাবে দেহের খাজনা দেয় তারাই কর্তাভজা। কর্তাভজাদের দৃষ্টিতে বিনাশুল্কে কারও জায়গায় বসবাস করা রীতিমত অন্যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা মানুষ গুরুর মাধ্যমে স্রষ্টাকে মাসিক অথবা বার্ষিক হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দেয়।[৩৬]

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশের মূল কারণ চরম আন্তঃধর্মীয় সম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। জাতিবর্ণ প্রথার কারণে নিম্নবর্ণের হিন্দুর নাভিশ্বাস ওঠে এবং তা চরম সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি করে। অস্পৃশ্যতার দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যে বৈষম্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সে অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে মানব সমাজে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মত মানবতাবাদী দার্শনিক মতবাদের আত্মপ্রকাশ অনিবার্য হয়ে পড়ে।[৩৭]

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গের নদীয় জেলা সংলগ্ন এলাকায় যে কর্তাভজা সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে তার মূল কারণ ছিল উচ্চবর্গ সৃষ্ট বর্ণ-বৈষম্য। সুফি চেতনার ধারাবাহিকতায় বৈষ্ণব আন্দোলন অতঃপর কর্তাভজা আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছিল মূলত বাঙালী সংস্কৃতিতে। সবারই মূল লক্ষ্য ছিল বৈষম্যবাদ বিরোধী অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করা। বাঙালী সংস্কৃতির ধারক ও বাহকের মাঝে মধ্য প্রাচ্য ভিত্তিক ইসলামী মূল্যবোধ পুরোপুরি খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সুফিবাদ যেভাবে বিকশিত হওয়ার কথা সেভাবে বিকশিত হয়নি। আবার সংসারী মানুষের জন্য বৈষ্ণব ধর্মের বিধান ছিল অপেক্ষাকৃত দূর্বল। এই কারণে সাধারণ মানুষ যারা নিপীড়নের শিকার হচ্ছিল তাদের সবাই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হতে অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় শোষিত ও বৈষম্য কবলিত সামন্ত সমাজের মানুষ নতুনের সন্ধান করতে থাকে। এমনই পরিস্থিতিতে শ্রী চৈতন্য নাম পাল্টিয়ে হলেন আউল চাঁদ (কর্তাভজাদের বিশ্বাস)। বৈষ্ণবের বদলে তার সম্প্রদায়ের নাম দিলেন কর্তাভজা। কর্তাভজা সম্প্রদায় সমাজ সংস্কারমূলক একটি সামাজিক আন্দোলন। এটি মানব মুক্তির আন্দোলনও বটে।[৩৮]

সনাতন হিন্দু সমাজকে জাতিবর্ণ প্রথা থেকে মুক্ত করার জন্যে ৪ জাতি ৩৬ বর্ণ ৬৭৪৩ শ্রেণি একাকার করতে এবং হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর করে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে যে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল সে ব্যাপারে অনেক রকম কিংবদন্তী আছে। সর্বাপেক্ষা আলোচিত কিংবদন্তি হলো ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় কোন এক শুক্রবারে মহাদেব নামের এক বারুই তার পানের বরজে আট বছর বয়সী বালকরূপে কর্তাভজা নির্মাতা আউল চাঁদকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। আউল চাঁদ সেখানে সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত অতিবাহিত করে নদীয়া জেলার বারাকপুর মহকুমার ত্রিবেণী ঘাট সংলগ্ন বেজড়াগ্রামে উপস্থিত হন। আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের পরে সেখানে সদগোপ বংশীয় রামসরণ পাল, কানাইঘোষ, হটু ঘোষসহ মোট ২২ জনকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ে দীক্ষিত করেন।[৩৯]

অন্য আরেকটি কিংবদন্তী থেকে জানা যায় একটি গরু মারা যাওয়ায় রামসরণ পাল ও কানাই ঘোষ চিন্তাযুক্ত মনে এক জায়গায় বসে আলাপ করছিলেন। এই সময় আলখেল্লাধারী এক ফকির এসে সেখানে উপস্থিত হন। ফকিরের

কেরামতিতে তার গরু বেঁচে গেলে পাল মহাশয় তার প্রতি কৃতজ্ঞ হলেন এবং তাঁর কথায় অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী চেতনাজাত ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী কর্তাভজা লোকধর্মে দীক্ষিত হলেন। এই দিনটি ছিল শুক্রবার।[৪০] কর্তাভজা সম্প্রদায় গণতান্ত্রিক এবং সমন্বয়বাদী চিন্তাচেতনায় বিশ্বাস করে। এই প্রসঙ্গে খান (২০০৫) এর বক্তব্য অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য। তাঁর মতে,

> পিতার নাম ইসমাইল, ছেলে গোবিন্দ, এক মেয়ের নাম আয়েশা অন্যজন শ্রাবন্তী। ছেলে স্কুলে কোরান পড়ে, মেয়ে গীতা এটিই রীতি কর্তাভজা তথা ভগমেনে[৪] সম্প্রদায়ে।[৪১]

কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে এই ধরণের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় এটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, উদার গণতান্ত্রিক নীতিমালায় বিশ্বাসী। উঁচু, নীচু, জাতি বর্ণ ভেদে এবং খন্ড-বিখন্ড মানব সমাজকে মানবধর্মে প্রভাবিত করাই ছিল এ সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য। বর্ণবাদ, বর্ণবৈষম্য থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার জন্য কর্তাভজা সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে। এই দেশের লৌকিক চেতনা চিরকালই ধর্মীয় গোঁড়ামী, ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং জাতপাতের বিরুদ্ধে। বস্তুতঃ এই কারণে মানবমুক্তির লক্ষ্যে উদ্ভুত কর্তাভজা দৃষ্টিভঙ্গি খুব দ্রুত বিকশিত হয়। ভারত এবং বাংলাদেশের ধর্মসংস্কার আন্দোলনে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। সমাজ সংস্কারে এই সম্প্রদায় সংগীত আশ্রয়ী। অন্যান্য লোকধর্মের সাথে (folk religion) সাথে কর্তাভজা সম্প্রদায় এক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ। ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত সব লোকধর্মের বা উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (sects) ন্যায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মূল সংগ্রাম ছিল ব্রাহ্মণসৃষ্ট জাতিবর্ণ প্রথার প্রতিবাদ জানানো। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর (২০১০) ভাবের গীত থেকে উদ্বৃতি দিয়েছেন-

> দেখ মগ ফিরিঙ্গি ওলন্দাজ হিন্দু মুসলমান
> এক বিধাতায় গড়েছে
> বস্তু তাই আছে সব দেহে সমান।
> দেখ ছত্রিশ বর্ণ সকলকে মানুষ বলে কয়
> গ্রন্থকারে লিখলে ধরে মানুষ একটি হয়।[৪২]

ভাবেরগীত থেকে বোঝা যায় সমাজে জাতিবর্ণ প্রথা ছিল, সমাজে ছিল মানুষে মানুষে বৈষম্য। যারা গ্রন্থ রচনা করত তাদের রচনায়ও বৈষম্য প্রকাশ পেত। সুতরাং বলা যায় মানব সৃষ্ট বৈষম্য এত চরমে পৌঁছেছিল যে কর্তাভজা সম্প্রদায় সমন্বয়বাদী মনোভাব নিয়ে সমাজ শাসনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার তীব্র যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসতে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সদস্যরা ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী গীত পরিবেশন করত এবং আজও সে গীতগুলো অমর অক্ষয় হয়ে আছে। শোষণ হীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিফলন আছে কর্তাভজা সংগীত এবং তাদের অন্যান্য আচার আচরণে। প্রসঙ্গত সরদার (২০০৫) এর সংকলিত একটি গীতের উল্লেখ করা যেতে পারে-

> বেদে না জানে তারে, বেদ বিধির অগোচরে,
> আসিয়ে এই সংসারে বসলেন হালিশ্বর।
> এবার সে ৩৬ বর্ণের ভান গুচাইয়ে
> করতেছেন সে একাকার।[৪৩]

সরদার (২০০৪) এর এই গীত থেকে বোঝা যায় যে, জাতিবর্ণ প্রথার সকল বন্ধন ছিন্ন করে মানবের মুক্তির জন্য সাম্যের বার্তা নিয়ে সমাজে আত্মপ্রকাশ করে কর্তাভজা সম্প্দ্রায়। লোকধর্মের মূল্যায়ণে এবং সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠায় এই সম্প্রদায়ের সমাজতাত্ত্বিক মূল্য তাই অপরিসীম।

৪। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অপর নাম ভগমেনে সম্প্রদায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের লোকধর্মে বিদ্যমান সুফি, বাউল, বৈষ্ণব অথবা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সংগীত, গুরু তত্ত্ব, ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, মানবপ্রেম প্রভৃতি অভিন্ন চেতনায় উদ্ভুত। সুফিবাদে পারস্যের প্রভাব, বৈষ্ণববাদে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব, বাউল তত্ত্বে সুফি বৈষ্ণবের প্রভাব এবং কর্তাভজায় সুফি-বৈষ্ণব-বাউলের প্রভাব ছাড়াও গার্হস্থ্য ধর্মে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অবশ্য কর্তভজাদের গার্হস্থ্য ধর্মের ধারায় রক্ষণশীলতা রয়েছে। তবে সবারই লক্ষ্য বৈষম্য থেকে আর্তপীড়িত মানুষকে মুক্তি দেয়া। সুফি, বাউল, বৈষ্ণব চেতনাজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় রাষ্ট্রধর্মের স্বীকৃতি না পেয়ে প্রান্তিক মানুষের উপ ধর্ম হিসেবে বেঁচে আছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবন ধারায় উদার মানবতাবাদী লোকধর্মগুলো আবহমান কাল ধরে চর্চিত হলেও শাস্ত্রীয় ধর্মের নামে গোঁড়ামী থেকে যারা মুক্ত নয় তাদের সমালোচনা মুক্ত করা সম্ভব নয়। শাস্ত্রীয় ধর্মের অনুশীলনে ব্যস্ত সুবিধাভোগীরা উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় বা লোকধর্মের লোকসংগীত মঞ্চস্থ করে বাহাবা কুড়ায় কিন্তু বাস্তবে তারা লোকধর্মের ধারক-বাহকদের অন্তর দিয়ে ভালবাসেনা; বাস্তব প্রয়োজনে পাশে যায় না। এতদসত্ত্বেও এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সুফি, বৈষ্ণব, বাউল, কর্তাভজা, ব্রাহ্ম অথবা মতুয়া লোকধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিকে হারিয়ে যেতে দেয়নি। এই ভুখণ্ডের মানুষ, শ্রেণী স্বার্থ, সম্প্রদায়িক বিভেদ এবং ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ভুলে বৈষম্য আর শোষণ, নির্যাতন থেকে বাইরে চলে এসেছে। এই অঞ্চলের জনসাধারণ এভাবেই কখনও সুফিবাদ, কখনও বৈষ্ণববাদ, কখনও বাউল মতবাদ, কখনও কর্তাভজা, কখনও ব্রাহ্ম আবার কখনও মতুয়া সম্প্রদায়ের মত অসংখ্য উপ-ধর্মীয় গোষ্ঠী (sects) বা লোকধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। রুখে দিয়েছে মানবসৃষ্ট বর্ণবাদ, শোষণ আর নিপীড়ন নামের অসুস্থতাকে।

এই কথা স্মর্তব্য যে, সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ, বাউল মতবাদ, কর্তাভজা, ব্রাহ্ম আন্দোলন, চার্বাক মতবাদ এবং মতুয়া সম্প্রদায় প্রত্যেকটিই এই অঞ্চলের প্রতিবাদী লোকধর্ম বা উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়। কোনটি ইসলামের তথাকথিত অনুশাসনের প্রতিবাদী চেতনা, কোনটি সনাতন ধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়, কোনটি ইসলাম ধর্ম এবং সনাতন ধর্মের মূল্যবোধ গ্রহণ করে আত্ম প্রকাশ করেছে বাউল হিসেবে। এই বাউলেরই একটি শাখা কর্তাভজা সম্পদ্রায়। তবে এরা সংসার ধর্ম পালনে অভ্যস্ত বাউল ঘরানার আদর্শে বিশ্বাসী। আলোচ্য উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো মৌলিকভাবে গুরুবাদী চেতনা বিশ্বাস ও লালন করে। মানুষের সাথে মানুষের ব্যবধান তাদের কাছে বেমানান। লোকধর্মের মৌলিক উদ্দেশ্য শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। বর্ণ বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি ছিল সামাজিক আন্দোলনের এক মাইল ফলক। এই মাইল ফলকের সাথে যুক্ত আরেকটি নাম ব্রাহ্ম আন্দোলন। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অংশীদার এই লোকধর্ম বা উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে পরবর্তী অংশে বিশ্লেষণ করা হলো।

৫.৫ ব্রাহ্ম আন্দোলন

সমাজ বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী আদিম যুগের মানুষ জীবিকার সন্ধানে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। এক পর্যায়ে তারা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত হলেও তাকে মোকাবেলা করতে হয় তিন ধরনের প্রতিপক্ষ। এই তিন প্রতিপক্ষ যথাক্রমে অন্য গোষ্ঠীর মানুষ, হিংস্র প্রাণী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দীর্ঘদিনের অব্যাহত প্রচেষ্টায় অনেক কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসলেও মানব সভ্যতার নষ্ট সন্তান হিংসা এবং সাম্প্রদায়িকতা থেকেই গেল।[৪৪] অবশ্য মানব সমাজ থেকে এটি নির্মুলের লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম প্রয়াস চলেছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন অনেক মহামানব। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন কবিতার আলোকে বলা যায়,

> ভগবান, তুমি যুগে যুগ দূত পাঠায়েছ বারে বারে
> দয়াহীন সংসারে–
> তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে,' বলে গেল
> ভালোবাসা–
> অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'...
> যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
> তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি ঠিক বেসেছ ভালো ?[৪৫]

এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বলা যায় অনেক ক্ষণজন্মা মহা মানবের মত সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করার মত। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতের নাম ব্রাহ্মধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজ। ভক্ত এবং সুধী সমাজের কাছে তিনি মানব মুক্তির অন্যতম অগ্রপথিক হিসেবে পরিচিত। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমত ব্রাহ্ম আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃত। এই দর্শনের ভিত্তিতে মানুষসহ সৃষ্টির সকল প্রাণীর প্রতি মানবিক হওয়ার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এটি একটি মনো-সামাজিক প্রপঞ্চ।[৪৬] সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যকার অহিংসা এর মুখ্য অনুঘটক। আমিত্ব এখানে নির্বাসিত। ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তিত মানবতাবাদ ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, বংশগতি, বর্ণবাদ এবং ভূগোলের বেড়াজাল মানতে চায় না। যুক্তিবাদী ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানসম্মত চেতনা ব্রাহ্ম আন্দোলনের মৌলিক সোপান।[৪৭] পুনুশ্চঃ উদার মনুষ্যত্ব তথা যুক্তি ও বিজ্ঞান মনস্কতা এ আন্দোলনকে করে গতিশীল। অধিকার অর্জন, দায় দায়িত্ব পালন এবং আদর্শিক যোগ্যতাভিত্তিক সমাজ গঠন এর সাথে সম্পৃক্ত। সমাজ সচেতন মানুষের কাছে বৈষম্য বা অসাম্যের বিপরীত অবস্থার নাম ব্রাহ্ম সমাজ।[৪৮] সমাজের প্রতিটি সদস্যের তার প্রাপ্য অনুযায়ী মৌলিক অধিকার ভোগ করা একটি জন্মগত সামাজিক অধিকার। তাই ব্রাহ্ম আন্দোলনে শ্রেণি বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য এবং জ্ঞাতি হিংসাসহ কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট সকল প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতি নিন্দনীয় অপরাধ।[৪৯] ধন, জ্ঞান, মান, ধর্ম পালনের ন্যায্য অধিকার এখানে সর্বজনীন।[৫০] রেঁনেসার যুগে যেমন ইউরোপে মানবতাবাদের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক রকম বাক বিতণ্ডা হয়েছিল ঠিক তেমনি রামমোহন যুগেও হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষতা ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম অনুষঙ্গ। এটি সমাজ সংস্কারমূলক একটি প্রপঞ্চ। জীবন ও জগৎ জিজ্ঞাসা, অমিত কৌতুহল, অনুসন্ধিৎসা, নির্মিৎসা, উপচিকিৎসা, শ্রেয়োচেতনা, মর্ত্য-প্রীতি, জীবনানুরাগ আর রূপ তৃষ্ণা বা সৌন্দর্য চেতনা প্রভৃতির সামূহিক ও সমষ্টিক অভিব্যক্তিই হচ্ছে ব্রাহ্ম চেতনা।[৫১] প্রাথমিকভাবে ব্রাহ্ম আন্দোলন শাস্ত্রীয় ধর্মের বণবাদী চেতনা উপেক্ষা করে। ধর্মনিরপেক্ষতা, নীতিশাস্ত্র এবং ন্যায়বিচার এর প্রতিভু। নৈতিকতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবেও ব্রাহ্ম আন্দোলনের ভূমিকা রয়েছে।[৫২] প্রকৃতপপক্ষে ব্রাহ্ম আন্দোলন সংগঠিত হয় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষের বাংলা অঞ্চলে এ আন্দোলন বিকশিত হয়। ধর্মান্ধতা, অহংবোধ, সামন্ততন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, কুসংস্কার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা প্রভৃতি বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে মানুষের চেতনায় সৃষ্টি হয় নতুন দিগন্ত। দেশ, কাল, ভূগোলের বেড়া ছিল এখানে অনুপস্থিত। ব্রাহ্ম ধর্মীয়

চেতনার কারণে মানুষের মানবীয় এবং যৌক্তিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ হলো প্রসারিত। মানুষের মাঝে প্রতিভার অফুরন্ত দরজা গেল খুলে। সমাজে শুরচ হলো বিজ্ঞানমনস্ক মুক্তবুদ্ধির চর্চা।[৫৩] সমাজ পেল আত্মিক উন্নয়নের ঠিকানা। নানা রকম সীমাবদ্ধতার কারণে সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তা পুরোপুরি পৌঁছায়নি; কিন্তু এর প্রভাব পড়েছিলো সর্বত্র। বাংলার মানবতাবাদী সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। স্বতঃস্ফূর্ত ব্রাহ্ম আন্দোলনে বিশ্বাসীদের কাছে ব্রাহ্মধর্ম একেশ্বরবাদী, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং যুক্তিবাদী দর্শনের ধারক ও বাহক হিসেবে পরিচিতি পায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রচলিত পৌত্তলিকতাবাদে ব্রাহ্মদের কোনো বিশ্বাস থাকে না। ধর্মীয় সাম্যবাদ এবং অখণ্ড মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা এ সমাজের মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়। তারা অন্তরে লালন করে একেশ্বরবাদ। প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন হয়ে দাঁড়ায় সমাজ চলার পাথেয়। এই সমাজ বা ধর্মের মূল কথা হলো ধর্মান্তর নয়, বিদ্যমান ধর্মের সংস্কার সাধন এবং সকল ধর্মের সারকথা অন্তরে ধারণ। সুতরাং বোঝা যায় সর্ব ধর্মের সারবস্তুই হলো ব্রাহ্মধর্ম (ব্রহ্ম+অ)। বেদ বিরোধী ব্রাহ্মধর্মে সর্ব ধর্মের লোকের প্রবেশাধিকার ছিল স্বীকৃত।[৫৪] সুতরাং বলা যায় এই ধর্ম পরিণত হয় সর্ব প্রকার কুসংস্কার বিবর্জিত ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক, বাহক এবং রক্ষক। লক্ষ্য বাস্তবায়নে তাদের অনুসারীরা হয়ে পড়ে প্রগতিশীল এবং উদার মানবতাবাদী। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ মেলে ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনায় বাংলার প্রচলন। কর্তভজা এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের আকর গ্রন্থ 'ভাবের গীত' (১৩১৩ বাং) এবং 'শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত' (১৯১৭) বাংলায় লিখিত। এটি একটি সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন। সব রকম সামাজিক অনাচারের বিরচদ্ধে ছিল এর দৃঢ় অবস্থান। অব্রাহ্মণ আচার্য নিয়োগ তার উপযুক্ত প্রমাণ। জাতিভেদ প্রথা ব্রাহ্মসমাজে ছিল নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। আর সে কারণে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে সকলের সমান সুযোগ নিয়ে প্রার্থনার অধিকার ছিল ব্রাহ্ম উপাসনায়। একই কারণে এক আসনে বসে পানাহারেও ছিল না কোনো আপত্তি।[৫৫]

জ্ঞান রাজ্যের যে কোনো দার্শনিক ভিত্তি বিনির্মাণে অন্য দর্শনের প্রভাব যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র কিংবা কার্ল মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কথা এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মূল কথা হলো পুরাতন অবস্থার সাথে সমাজে বিদ্যমান বিপরীত অবস্থার দ্বন্দ্ব এবং পুনরায় নতুন অবস্থার সৃষ্টি। এটি ধীরে ধীরে পুরাতন অবস্থায় চলে গেলে তার সাথে আবারও বিপরীত অবস্থার দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।[৫৬] ব্রাহ্মসমাজও অনেকটা সেভাবেই 'রেঁনেসা' ও 'মানবতাবাদ'-এর কাছে দায়বদ্ধ। যদিও ইউরোপীয় রেঁনেসার সাথে বাঙালি রেঁনেসার তফাৎ রয়েছে বিস্তর তথাপি বাঙালির জাতীয় জীবনে ঊনবিংশ শতাব্দী রেঁনেসা যুগ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তবে এই কথাও ঠিক বাঙালি সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে ইউরোপীয় রেঁনেসার প্রভাব পড়েনি। রেঁনেসার সময় সমাজ বদলের অনুষঙ্গ হিসেবে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থার জন্য যা যা করেছিল, বাংলায় উদ্ভূত ব্রাহ্ম আন্দোলনও বহুলাংশে তাই করেছিল। বাঙালি সমাজের একটি বিশেষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অংশে ব্রাহ্ম আন্দোলন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের মত। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলায় উগ্র বর্ণবাদ দূর্বল হতে শুরচ করে। শক্তিশালী ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী মানবতাবাদী আন্দোলন উণবিংশ শতাব্দীতে যে সকল সামাজিক, ধর্মীয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এই অঞ্চলের মানুষের মানবিক চেতনায় আমুল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল তার মূল লক্ষ্য ছিল প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যবাদী কুসংস্কারের বিরচদ্ধে বিশেষ সংস্কার সাধন। ইউরোপীয় রেঁনেসার মূল ভিত্তি হলো শিক্ষা এবং যুক্তি। বাংলার শিক্ষিত সমাজ এই যুক্তি এবং শিক্ষার উপর দাঁড়িয়ে ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে

সমাজ সংস্কারকে এগিয়ে নিয়েছিল। এই সব সংস্কার আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকায় ছিল সে সময়ের এক দল বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিশীল শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। সুদূর প্রসারী মানবতাবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খায় তারা শুরচ করেছিল মানবতাবাদী যৌক্তিক আন্দোলন। বলা যায় এই কারণে সাধারণ মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া শুরচ করে। অনেক ক্ষেত্রে এসব সংস্কার আন্দোলন সমাজে সুষম আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির প্রেক্ষাপট তৈরীতেও ভূমিকা রাখে। তৎকালীন সামাজিক অনাচারের বিরচদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মধর্ম বা সমাজের মূল প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)।[৫৭] তাঁর চেতনা বৌদ্ধ দর্শন দ্বারও প্রভাবিত। মানবতাবাদী সহজিয়া আন্দোলনের প্রভাবও এখানে কম ছিল না। উল্লেখ্য সহজিয়া একটি বিশেষ সম্প্রদায় বিশেষ যাদের সাধন পথ একেবারেই সহজ। সহজ শব্দের অর্থ যা সঙ্গে সঙ্গেই জন্মায়। সহজ শব্দের আরেকটি অর্থ হলো যা মানুষের স্বভাবের অনুকূল। এখানে মানুষ স্বভাবকে পুরোপুরি উপেক্ষা না করে বরং স্বভাবের অনুকূল পথে আত্মোপলব্ধির চেষ্টা করে।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা রাজা রামমোহন রায় বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী এবং হিব্রচ ভাষায় সমভাবে ছিলেন সুপণ্ডিত। এখানে তাঁর জ্ঞান পিপাসা এবং কল্যাণমুখী আচরণের পরিচয় মেলে। এটি তাঁর সর্ব ধর্মের সারবস্তু গ্রহণের অকৃত্রিম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। রেঁনেসা আর মানবতাবাদের মৌলিক চেতনা ধারণ করে ব্রাহ্মসমাজ রচনা করে অসাম্প্রদায়িকতার মজবুত ভিত। মানবতার মহা কল্যাণের নিমিত্তে রাজা রামমোহন রায় বেদ, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, মনুসংহিতা, কোরাণ ও বাইবেল বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করেন। বলা যায় এ রকম বলিষ্ঠ নৈতিকতার কারণে তিনি একেশ্বরবাদী চিন্তা চেতনা ধারণে সমর্থ হন। স্বদেশী শিক্ষার পপাশাপাশি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রাজা রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। লক্ষ বাস্তবায়নে তিনি পৌত্তিলিকতাবাদের বিপরীতে প্রতিষ্ঠা করেন 'আত্মীয় সভা'। এই সভায় তিনি সহযোদ্ধা হিসেবে যাদের পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন গোপীমোহন ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী, নন্দ কিশোর বসু, বৃন্দাবন মিত্র, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরতন হালদারসহ আরও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি। তাদের সমাজ বিশ্লেষণে হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের নানা দিক উঠে আসত। রামমোহনের এ সব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,"দেশ যখন অন্ধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল, অন্ধ বিশ্বাস তার জীবনধারাকে রচদ্ধ করেছিল, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা সকল ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা লুপ্ত হয়েছিল; জাতি যখন কয়েকটি ক্ষয়িষ্ণু ধারা এবং প্রথাকে সার সত্য জ্ঞান করে আঁকড়ে ধরেছিল; সেই ক্রান্তিকালে রাজা রামমোহন রায় ভারত ইতিহাসের মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"[৫৮] এই বক্তব্য থেকে ধরে নেয়া যায় রাজা রামমোহন রায় মানবতবাদে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তিনি আত্মীয় সভায় জাতিভেদ প্রথার ত্রচটি, সতিদাহ প্রথা, বহুবিবাহ, পৌত্তিলিকতা প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সমালোচনা করে বর্ণবাদী সমাজের বিপরীতে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন।[৫৯] রাজা রামমোহনের অন্তরে রেঁনেসা ও মানবতাবাদের প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল যে তিনি ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের মত একেশ্বরবাদী চিন্তা চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিমালার অনুরূপ একেশ্বরবাদী ব্রহ্মোপসনার উপলব্ধি থেকে সৃষ্টি করলেন 'ব্রাহ্মধর্ম'। এখানে রেঁনেসার প্রভাব স্বীকৃত। উল্লেখ্য রেঁনেসা ও মানবতাবাদ একে অপরের পরিপূরক। এই প্রসঙ্গে বলা যায় রেঁনেসা ও মানবতাবাদের চেতনাজাত ব্রাহ্ম আন্দোলন ভারতবাসীর অগ্রগতি ও মুক্তির অগ্রপথিক। এটি মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার

সুস্পষ্ট অনুঘটক। ব্রাহ্ম আন্দোলন সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরচদ্ধে ছিল শাণিত আক্রমণ। এর ফলে এই অঞ্চলের মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ পরিস্কার হয়। যুক্তিবাদ ও সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞান মনস্কতার মূল্য এখানে অনেক বেশি। ভারতবর্ষের এ অঞ্চলে সর্ব ধর্ম সমন্বয় ও মানবতাবাদের বীজ লুক্কায়িত ছিল রেঁনেসার অনেক গভীরে যার বাস্তব রূপ ব্রাহ্ম আন্দোলন।[৬০]

ব্রাহ্মসমাজের আদর্শিক ভাবধারায় মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮২১ সালে রাজা রামমোহনের উদ্যোগে 'সম্বাদকৌমুদী' ও 'Brahmunical Magazine' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ হয়। একই উদ্দেশ্যে ১৮২২ সালে ফারসী ভাষায় প্রকাশিত হয় 'মীরাৎ-উল-আখবার' নামে আরও একটি পত্রিকা। ব্রাহ্মসমাজের মানবতাবাদ প্রসারের জন্য ব্যবহৃত হত এ সকল প্রকাশনা। এই সব সংকলনের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা। এর জ্বলন্ত প্রমাণ সতীদাহ প্রথাসহ সকল প্রকার সামাজিক কুসংস্কারের বিলোপ সাধনের প্রয়াস। 'আত্মীয় সভার' চেতনায় যে যুক্তিবাদী সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রার্থনা করার সম অধিকার নিশ্চিত ছিল। উল্লেখ্য মতয়া সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মধর্ম উভয়ই স্বতন্ত্র মন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রার্থনা সভা করে। বর্ণ হিন্দুর মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য তারা আন্দোলন করিনি। তারা সংগ্রাম করেছে বর্ণবাদী আচরণের বিরচদ্ধে। সে যাই হোক হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, তেলি, মালি, কর্মকারসহ সকলের একত্রে বসে উপাসনা ও ভোজন করার এমন নজির মানবতাবাদ ছাড়া সম্ভব নয়।[৬১] সম্রাট আকবরের দীন ইলাহী, গৌতম বুদ্ধের 'বৌদ্ধ মতবাদ', বাংলদেশ ও ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গি ব্রাহ্মসমাজের মানবতাবাদের সাথে তুলনীয়। বাংলায় বিদ্যমান লোকধর্মগুলোও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শিক চেতনা লালন করে। আর এর শেকড় নিহিত পাশ্চাত্যের রেঁনেসা আন্দোলনের মাঝে। তবে একথাও ঠিক ব্রাহ্ম আন্দোলন রামমোহন যুগের অবসানের অব্যবহিত পরেই দূর্বল হতে শুরচ করে। এই জায়গাটিতে মতুয়া আন্দোলন অথবা কর্তাভজা আন্দোলনের পরিণতির সাথে মিলে যায়। গুরচচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মতুয়া সম্প্রদায় সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হতে থাকে। একইভাবে আউলচাঁদ বিহীন কর্তাভজা আন্দোলনও আর সেভাবে এগুতে পারেনি। কেননা মানুষের আবেগ সেখানে মাবতাবাদের ভূমিতে বিচরণের চর্চা থেকে বঞ্চিত হয়।

জ্ঞান পিপাসু রামমোহন রায় ১৮৩০ সালে বিলেত গমন করেন এবং ১৮৩৩ সালে সেখানেই তাঁর জীবনাসান হয়। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন সাময়িক স্তিমিত হলেও তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কেননা রামমোহনের অবর্তমানে এই মানবতাবাদী আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। পরবর্তীতে দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)। ব্রাহ্মধর্মের মানবতাবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি ১৮৩৯ সালে স্থাপন করেন 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। রামচন্দ্র তর্কবাগীশের পরামর্শক্রমে পরবর্তীতে ১৮৪০ সালে এর নামকরণ করা হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'।[৬২] 'ব্রাহ্মসমাজ' ও 'তত্ত্ববোধিনী' সভার মধ্যে আদর্শিক কোনো পার্থক্য না থাকার কারণে ১৮৪৩ সালে মাত্র ২১ জন সঙ্গী নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে 'ব্রাহ্মধর্ম' দীক্ষা নেন। এর অব্যবহিত পরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম এবং উপনিষদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হলেন। বাংলার রেঁনেসা ব্রাহ্মধর্মকে সার্বজনীন মানবতাবাদে রূপ দেয়ার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেক পরিশ্রম করেন। তাঁর উপলব্ধির মূলে ছিল মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে যাওয়া। হরিচাঁদ ঠাকুরও মানব

প্রেমের কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে লালন ফকিরের দেহতত্ত্ব গানও বেশ প্রাসঙ্গিক। তিনি গেয়েছেন "মানুষ ছাড়া খ্যাপারে তুই মূল হারাবি/মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।"[৬৩] এটিও বাংলায় সপ্তদশ শতাব্দীর আরেক রেঁনেসা আন্দোলন। আসলে বাংলায় যত মানবতাবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তার সবই মৌলিকভাবে রেঁনেসা আন্দোলনের কাছে কমবেশী দায়বদ্ধ। আর আন্দোলন সূত্রপাতের মূল কারণ আর্য সৃষ্ট বর্ণবাদ।

সে যাই হোক সাম্যবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে অখণ্ড মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠাই ছিল ব্রাহ্মধর্মের মূল লক্ষ্য।[৬৪] আমরা জানি শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানী করে। ধর্ম মানুষকে বিনয়ী করে। শিক্ষার সাথে ধর্মের সংমিশ্রণে মানুষ শ্রদ্ধার সম্পদে পরিণত হয়। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রবক্তারা এ শ্রদ্ধার সম্পদ হতে পেরেছিল বলেই তারা মানবতাবাদের দিশারী হতে পেরেছিল। ১৮৩৪ সালের ২১ ডিসেম্বর অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনকে বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক মানবতাবাদী মর্যাদায় পৌঁছানোর নিমিত্তে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যারাই ব্রাহ্মধর্মের হাল ধরেছিলেন তাদের সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এবং রেঁনেসার চেতনা ধারণ করে অখণ্ড বাংলায় মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পরিহার করেছিলেন ধর্মের গোঁড়ামীপনাসহ সকল প্রকার মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড। ধর্ম সম্পর্কে তাদের প্রগতিশীল এবং উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে খোদ ব্রাহ্মসমাজেই অক্ষয়কুমার দত্তের কট্টর পন্থার সমালোচনা হয়েছিল।[৬৫] এই সম্পর্কে ভারতীয় 'মিরর' পত্রিকার মন্তব্য হলো-"ব্রাহ্মসমাজের নেতিবাচক সমালোচনা এবং ক্রিয়াকলাপের ধ্বংসাত্মক অংশটি ত্রিশ বছর পূর্বে প্রধানত তাঁর দ্বারাই সম্পাদিত হয়।"[৬৬] এতদসত্ত্বেও তিনিই প্রথম ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনায় সংস্কৃতের বদলে বাংলা প্রচলন করেন। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ এভাবে আরও আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করে। ব্রাহ্মধর্ম বা সমাজ পায় কাঙ্খিত বৈজ্ঞানিক মর্যাদা। এই বৈজ্ঞানিক আন্দোলনে ১৮৫৭ সালে সংযুক্ত হন কেশবচন্দ্র সেন। ব্রাহ্মধর্মকে তিনি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রয়াসী ছিলেন। এই মানসিকতায় রাজা রামমোহন রায়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলনে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ব্রাহ্মসমাজের প্রবক্তাদের কাছে সতীদাহ প্রথা ছিল নরহত্যার মত অমানবিক কাজ। তাই এ সমাজের প্রবক্তারা এটি বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। আর এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বাংলার রেঁনেসা আন্দোলনের অগ্রসৈনিক কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬২ সালে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত হন এবং ব্রাহ্মধর্মের আচার্যের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অব্রাহ্মণ আচার্য। এই বক্তব্য প্রমাণ করে ব্রাহ্মধর্মে রেঁনেসার দর্শন স্বীকৃত।

তবে ব্রাহ্মধর্মের উদ্যেক্তাদের অনেকেই সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে না পারাায় অব্রাহ্মণ আচার্য নিয়োগে বিরূদ্ধাচরণ করেন এবং ১৮৬৬ সালের ১১ নভেম্বর কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠন করেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। এর প্রতিষ্ঠাতাদের ইচ্ছা ছিল একে সমগ্র মানবতার সমাজরূপে পরিচিত করানো। অব্রাহ্মণ আচার্য নিয়োগের বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা প্রচার করলেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সর্বস্তরের নারী-পুরুষ এই সমাজে উপাসনা করতে পারবে। শেষ পর্যন্ত ঐক্যের অভাবে ব্রাহ্ম আন্দোলন দর্শনের মধ্যে থেকে যায়। এটি বস্তুবাদের সার্থক রূপায়নে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। কেননা মূল ব্রাহ্ম চেতনার বিরোধিতাকারীদের মধ্যেও আদর্শিক মতবিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের অন্যতম একটি কারণ ছিল নিজের সৃষ্ট বিবাহ আইন ভঙ্গ করে উদ্যোক্তাদের একজন কেশবচন্দ্র সেন নিজের অপরিণতা কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের রাজকুমারের বিবাহ দেন। পৌত্তলিক নিয়মে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ায় ১৮৭৮ সালে কেশবচন্দ্রের

ব্রাহ্মসমাজের গর্ভেই জন্ম নেয় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। এটি ১৮৮০ সালে 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' নাম ধারণ করে। এখানেও বেদ, পুরাণ, বাইবেল, ললিতশাস্ত্র চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।[৬৭]

এই কথা স্মর্তব্য যে, ব্রাহ্মসমাজের যাত্রা (১৮২৮) কলকাতা থেকে শুরু হলেও এটি শুধুমাত্র সেখানে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি বিস্তার লাভ করে অখণ্ড বাংলার সর্বত্র। তখনকার বংলায় এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র।[৬৮] তাঁর আমন্ত্রণে ব্রাহ্মসমাজের প্রসারে একবার কেশবচন্দ্র সেন এবং বিজয় গোস্বামী ময়মনসিংহ টাউন হলে বক্তৃতা করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের ইংরেজি এবং বিজয় গোস্বামীর বাংলা বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে সময় বিভিন্ন বয়সের অনেক শিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রেণি পেশার লোক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ফলে কলকাতা ও ঢাকার বাইরে ময়মনসিংহেও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৬৯ সালে ঢাকায় বড় আকারের ব্রাহ্মমন্দির নির্মিত হয়। পরর্তীতে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, সিলেট ও অন্যান্য স্থানেও ব্রাহ্মমন্দির নির্মিত হয়। এসব মন্দিরকে কেন্দ্র করে স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরি, ছাপাখানা এবং সংহতি সভা গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে অনেকেই বর্ণহিন্দুর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন। এদের সবাই বর্ণ-বৈষম্যের হিংস্র থাবা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল।[৬৯] এভাবে রেঁনেসার প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যদিয়ে অখণ্ড বালায় ভিন্নমাত্রার উচ্চমার্গের মানবতাবদী আন্দোলন বহমান থাকে। হয়তো মৌলিক সে ব্রাহ্মসমাজ নেই, কিন্তু তার প্রভাব আজও সমাজে বহমান।

তবে এই কথাও ঠিক ব্রাহ্মসমাজ একটি মহান আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও এটি নানাভাবে সমালোচিত। প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যবাদের কারণে ব্রাহ্ম আন্দোলন সফলতার চরম সীমায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। একই কারণে বৌদ্ধ মতবাদ, বৈষ্ণব আন্দোলন, সহজিয়া আন্দোলনও ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়। ১৮৭০--১৮৮০ এর দশকে ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্যাতনের মাত্রা ছিল সীমাহীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে তার বাবা কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। ১৮৬৯ সালে বৈকুণ্ঠ ঘোষ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তার মা আত্মহত্যার হুমকি দেয়। ব্রাহ্মসমাজের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে টাঙ্গাইলের মন্দির নির্মাণ সামগ্রী সরিয়ে ফেলে বর্ণহিন্দুর দল। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে সেখানে মল ত্যাগের মত ঘটনা ঘটায়। যে পরিচ্ছন্নতা কর্মী ঐ মল পরিস্কার করে তার বাড়ি ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ময়মনসিংহের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব আনন্দমোহনও বর্ণবাদীদের রোষানলে পড়েন। তাঁর বড় ভাই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলে বর্ণবাদী সমাজপতিরা তাকে সমাজচ্যুত করেন।[৭০] বরিশালের তরুণ দুর্গামোহন দাস তাঁর বিধবা বিমাতাকে জনৈক ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে দেন। এই বিয়ের ফলও ভালো হয়নি। ডাক্তারের পরিণতি সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন," ডাক্তারের রোগীর সংখ্যা শূণ্যে নেমে এল এবং শেষ পর্যন্ত ডাক্তারকে অন্য পেশা গ্রহণ করতে হয়। ... দুর্গামোহন বাড়ি থেকে বের হলে রক্ষণশীল সমাজপতিদের লোকেরা তাঁকে ঢিল মারতেও ভুল করে নি...।"[৭১]

রক্ষণশীল সমাজপতিদের নেতিবাচক প্রভাব সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ আজও বেঁচে আছে। বলাই বাহুল্য সমাজের বেশিরভাগ নির্যাতিত গণ মানুষ রক্ষণশীলতার যাতাকলে এখনও সামাজিক কারণে বন্দী । বর্ণবাদের কারণে এ ভূখণ্ডে বৌদ্ধ দর্শন ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে, বাঁধাগস্ত হয়েছে মানবতাবাদী আন্দোলন। রেঁনেসার চেতনা বহমান আছে ঠিকই কিন্তু বাস্তবায়নে রয়েছে অনেক রকম বাঁধা। বলাইবাহুল্য আজকের বাংলদেশ তথা গোটা ভারতবর্ষে কোটিকোটি ধর্মান্তরিত মুসলমান জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিক্রিয়াজাত ফসল। নমঃশূদ্রদের হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া ধর্ম গ্রহণও

অনুরূপ দৃষ্টান্ত। আর্যসৃষ্ট বৈদিক সংস্কৃতির তথাকথিত ব্যাখ্যাই আজকের এই বিচিত্র সমাজ, সম্প্রদায় ও লোকধর্মের অস্তিত্ব সৃষ্টির মৌলিক কারণ। অবশ্য ব্রাহ্ম ধর্ম লোকসমাজে জন্ম না নিয়েও লোকমানসের চেতনা ধারণ করে বেঁচে আছে। বিষয়টি প্রশংসনীয়।

অখণ্ড বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদের কারণে ছাপ্পান্নটি মানবতাবাদী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আজ মুমূর্ষু। ঘটনা যাই থাক এই সব সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সাথে মানবতাবাদ ও রেঁনেসা আন্দোলনের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই যুক্তির সাথে রমাকান্ত চক্রবর্তীর অভিমত বেশ যুক্তিযুক্ত।[৭২] ব্রাহ্মসমাজ উপমহাদেশের আচরিত অন্যতম মানবতাবাদী ও সংস্কারবাদী সম্প্রদায়।[৭৩] বর্তমান প্রবন্ধে এই সমাজের প্রবক্তা রাজা রামমোহন রায়, তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ, রেঁনেসা আন্দোলন এবং মানবতাবাদ এই তিনের আন্তঃসম্পর্ক আলোচিত হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় প্রতিটি প্রত্যয় কোনো না কোনোভাবে পরস্পরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। সামগ্রীকভাবে বলা যায় ব্রাহ্মসমাজের ধ্রচ্পদী ব্যক্তিত্ব, তাঁদের সৃষ্ট দর্শন এবং তা তিরোধানে যৌক্তিক আন্দোলন বর্তমান প্রবন্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। উঠে এসেছে ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারের অনেক গুরচত্বপূর্ণ দিক এবং উন্মোচিত হয়েছে জ্ঞানার্জনের নব দিগন্ত।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে অনেক রকম সমালোচনা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষকের বিরচদ্ধে কুসংস্কারে আবদ্ধ শোষিত, নীপিড়িত সমাজকে রক্ষার আন্দোলন হলো হলো ব্রাহ্মধর্ম। এটি বিবেকবান মানুষের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, এটি বাংলার রেঁনেসা। ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ পুরচষ রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ কার্যত ঊণবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক। ব্রাহ্মসমাজ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র। প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গের সামাজিক আন্দোলনের মাঝে সমাজের কুসংস্কারে আবদ্ধ সমাজ খুঁজে পায় মুক্তির ঠিকানা, খুঁজে পায় প্রকৃত মানবতাবাদের দর্শন। সুতরাং বলা যায় ব্রাহ্ম্যসমাজে রয়েছে শক্তিশালী মানবতাবাদী চেতনা। নারীনীতি, শিক্ষানীতি, ধর্মনীতি, রাজনীতিসহ সকল বিষয়ে উত্তর অধুনিকতার ছাপ এখানে সুস্পষ্ট। সুতরাং বলা যায় ব্রাহ্মসমাজ, মানবতাবাদ এবং রেঁনেসা আন্দোলন একে অপরের পরিপূরক। বাংলা অঞ্চলের সামাজিক আন্দোলনে গোড়াপত্তনকারীএকটি দর্শনের নাম চার্বাক মতবাদ। এই বিষয়টি পরবর্তী অংশে বিশ্লেষণ করা হবে।

৫.৬ চার্বাক মতবাদ

চার্বাক একটি বস্তুবাদী দর্শন। অনুমান করা হয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী চার্বাক দর্শন বিকাশের যুগ হিসেবে স্বীকৃত। সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন দার্শনিক গ্রন্থে চার্বাক সম্পর্কে কিছু কিছু মত প্রচলিত আছে। এই যুগের দার্শনিকেরা চার্বাককে এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন।[৭৪] কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে চার্বাক দর্শন আজ বিলুপ্ত প্রায়। এটি ভারতের একমাত্র বস্তুবাদী চেতনার ধারক। ভারতীয় দর্শনে এটি অত্যন্ত সুপরিচিত।[৭৫] চারচ+বাক থেকে চার্বাক শব্দের উৎপত্তি। চারচ শব্দের অর্থ বৃহস্পতি যিনি দেবতাদের গুরু হিসেবে পরিচিত এবং বাক অধিপতি হিসেবে স্বীকৃত। বাক শব্দের অর্থ বচন। সুতরাং যারা বৃহস্পতির বাক অনুসরণ করে তারাই চার্বাক, তারাই লোকায়ত।[৭৬] তাই বলা যায় বৃহস্পতি প্রণীত শাস্ত্রই চার্বাক।

বৌদ্ধ ও চার্বাক উভয়েই বৃহস্পতির মত অনুসরণ করে বলেই অনেকে উভয় মতদর্শকে চার্বাক বলে অভিহিত করেছেন। উভয়েই অসৎ হতে সতের উৎপত্তির ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।[৭৭] এটি একটি নাস্তিক্যবাদী দর্শন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা কোনও ধর্মানুষ্ঠানই পালন করেন না। এরা লোকসিদ্ধ রাজাকেই ঈশ্বর হিসেবে গণ্য করেন। বেদ বিরোধী এবং শাস্ত্রীয় ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন নিন্দুক ঋষিগণ আদি চার্বাক মতবাদের প্রবক্তা। তাদের কাছে বেদ বোধিত জ্ঞান যথার্থ হিসেবে গৃহীত হয়নি। বেদ যে অপৌরচষের চার্বাক মতে তা অবিশ্বাস্য।[৭৮] এ দর্শনে স্বভাব নিয়মই জগৎ বৈচিত্র্যের একমাত্র নিয়ামক। অদৃষ্ট বা কর্মফল এখানে অনুপস্থিত। বেদ আরোপিত বর্ণবাদেও তাদের নেই কোনো বিশ্বাস।[৭৯] এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ঈশ্বর আছেন এ বিশ্বাসে তারা অনাস্থা স্থাপন করেছেন। তারা মনে করেন স্বভাবের নিয়ামক কোনও কারণ নেই। আদিতে স্বভাববাদ একটি স্বতন্ত্র মত ছিল। পরবর্তীকালে এটি চার্বাক মতের সহিত যুক্ত হয়।[৮০]

এই মতাবদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা আচার্য বৃহস্পতিকে দেবগুরচও বলা হয়। এই দেবগুরচ নাস্তিক্যমতের প্রবর্তক হিসেবেও স্বীকৃত। এরা বৈদিক ধর্মের শত্রচ।[৮১] হেমচন্দ্রের মতে, শরীর হতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তি। বৃহস্পতিকে চার্বাক মতবাদের আদি প্রবর্তক স্বীকারে অনেক মণিষী অবশ্য দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে চার্বাকমতের প্রথম প্রবর্তকের নাম অজিত কেশকম্বলী। এই মতবাদে দেহই আত্না। তারা দেহ ও আত্মাকে অভিন্নার্থক দৃষ্টিতে দেখেছেন। দেহাতিরিক্ত আত্মার কোনো প্রমাণ নেই–এটিই চার্বকের সিদ্ধান্ত।[৮২] গৌতম বুদ্ধ এবং বর্ধমান মহাবীরও বলেছেন,' তং জীব তং শরীরবাদ'। বলাইবাহুল্য হয়তো একারণে শাস্ত্রকারগণের কেউ কেউ গৌতমবুদ্ধকে চার্বাক নামেও অভিহিত করেছেন। তবে এ কথাও ঠিক উভয় দর্শনের মাঝে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৌদ্ধ দর্শন কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করলেও চার্বাক দর্শন তা স্বীকার করে না। চার্বাকে কর্মফল, আত্মার অস্তিত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বলে কিছু নেই, কিন্তু বৌদ্ধ মতবাদে ইহজাগতিক কর্মফল আছে। বৌদ্ধ মত প্রত্যক্ষ ও অনুমান দুটোকেই স্বীকার করে কিন্তু চার্বাকে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষকেই স্বীকার করা হয়। এটি সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁতের দৃষ্টবাদের সাথে মিলে যায়। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যায় চার্বাকদর্শন বাস্তববাদী। বৌদ্ধ দর্শন দুঃখবাদী হলেও চার্বাক দর্শন সুখবাদী।[৮৩] চার্বাক দর্শনে পরিদৃশ্যমান জগৎ আকস্মিক ও চতুর্ভৌতিক এবং চতুর্ভূতের মিলনে সৃষ্টি হয় চৈতন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থূল ইন্দ্রিয়োপভোগই পরম সুখ। চার্বাক মতে একদিকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই অন্যদিকে পরলোক, পুনর্জন্ম বা জন্মান্তর বলেও কোনো কিছুর অস্তিত্ব কিছু নেই। ধর্মাধর্ম, পাপ পূণ্য, যাগ যজ্ঞ, কর্মফল, স্বর্গ নরক,পরকাল, জন্মান্তর, ঋষি, অপ্রত্যক্ষ, বর্ণবাদ এবং দেব দেবতা বলে কিছু নেই। যা কিছু উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করা যায় না তার অস্তিত্ব চার্বাক দর্শনে বর্তমান নেই।[৮৪] তবে একথাও ঠিক সুশিক্ষিত চার্বাক সমাজের অনেকেই উপনিষদলব্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এই কারণে মূল চার্বাকে আকাশকে শূণ্য বা আবরণের অভাব বলা হলেও তাদের অনেকেই আকাশকে পঞ্চভূত বলে স্বীকার করেছেন।[৮৫] এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় চার্বাক সম্প্রদায়ের লোকেরা পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং আস্তিক্যবাদী দর্শন থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

চার্বাক মতের লোকেরা মনে করে ঐহিক, দৈহিক ও ক্ষণিক সুখই স্বর্গ। কন্টকাদিব্যথাজনিত দুঃখই তাদের কাছে নরক। সুশিক্ষিত চার্বাকগণের মতে দেহই আত্মা এবং অর্থ ও কাম পুরচষার্থ হিসেবে স্বীকৃত। বিদেহী আত্মা আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক ও অবাস্তব।[৮৬] চার্বাক মতবাদ অন্যান্য লোকধর্মের ন্যায় বেদ বিরোধী। যুক্তিহীন বিচার তাদের

কাছে অগ্রহণযোগ্য। এটিই চার্বাকের মৌলিক দর্শন। তিন শ্রেণির ব্যক্তি বেদের কর্তা–ভণ্ড, ধূর্ত এবং নিশাচর। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে চার্বাক মতের অনুসারীরা বেদ বিরোধী। তাদের এই বিরোধিতার কারণ বেদে অবিদ্যমান বস্তুর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ; প্রাধান্য দেয়া হয়েছে চৈতন্যহীন জড় পদার্থের প্রতি; তাছাড়া বেদে উল্লিখিত মন্ত্রে রয়েছে পরস্পরবিরোধী মন্ত্রের উপস্থিতি এবং অনিত্য দ্রব্য হচ্ছে বেদ রচনার ভিত্তি; বেদকে অপৌরুষের বলা হলেও কঠ, কৌথুম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে বেদ রচনার কথা জানা যায় এবং নিষ্কাম কর্মের বদলে লোভমূলক কর্মের প্রতি প্রাধান্য আরোপের অনেক প্রমাণ রয়েছে বেদে।

নানা রকম তথ্য প্রমাণ থেকে বোঝা যায় চার্বাক সম্প্রদায়ের লোকেরা শাস্ত্রীয় ধর্মে অবিশ্বাস স্থাপন করে সুক্ষ্মাতর আত্মার কোন সন্ধান করেন নাই।[৮৭] মনই হচ্ছে সংজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মণীষা, স্মৃতি ও সংকল্প। এই মনই কাম, যে কামকে ঋক বেদের ঋষি সৃষ্টির অগ্রজ বলে ঘোষণা করেছেন–'কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং তদাসীৎ'। এই মন যা হতে যাবতীয় অনুভব, যাবতীয় বোধ ও যাববীয় ইচ্ছা উৎপন্ন হয়–সেই মনই আত্মা। এই মনোময় আত্মাই দেহেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা।[৮৮] দুঃখকে ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা মেনে নিতে চায় না, বরং তারা বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বলতে চায় দুঃখ আছে বলেই সুখের এত মহিমা। চার্বাক দর্শন অনুযায়ী ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগের অন্তরায় এবং বিষয়ের প্রতি অনাসক্তিই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র পথ। চার্বাক দর্শন বস্তুবাদে বিশ্বাসী। আগেই বলা হয়েছে এখানে জন্মান্তরবাদ মুর্খের প্রলাপ হিসেবে গণ্য। চার্বাক মতে দেবগণের অস্তিত্ব নেই, ধর্ম বা অধর্ম বলে কিছু নেই, পূণ্য ও পাপের ফল বলেও কিছু নেই। যতদূর ইন্দ্রিয়গোচর হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও ততদূর পর্যন্তই, তার বাইরে নেই; প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। 'শতবর্ষ জীবিত থাক'---এই শুভ আশীর্বাণীও চার্বাক মত বিরোধী। এই দর্শনে বিশ্বাসীরা এত বেশি যুক্তিবাদী যে তারা দেহ ভিন্ন আত্মা থাকতে পারে এটি স্বীকার করতেই চায় না। এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত যথা-ধূর্ত চার্বাক, সুশিক্ষিত চার্বাক এবং বিতণ্ডাবাদী চার্বাক।

ন্যায়ানুগত বচন পরম্পরার নাম কথা। চার্বাক দর্শনে কথার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। চার্বাক পণ্ডিতদের মতে, কথা তিন প্রকার যথা- বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। পর পরাজয়ের জন্য নয়, কেবলমাত্র তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য যে কথা প্রবর্তিত হয় তার নাম বাদ। কথাতে বাদী ও প্রতিবাদী–উভয়েরই তত্ত্ব নির্ণয়ের দিকে লক্ষ্য থাকে। তত্ত্ব নির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য না রেখে প্রতিপক্ষের পরাজয় এবং নিজের জয়যাত্রা সাধনের জন্য যারা তর্ক বা বিচারে প্রবর্তিত হয়, সেরূপ বিজিগীষু কথার নাম জল্প। নিজের কোনো পক্ষ নির্দেশ না করে, কেবল পর পক্ষ খণ্ডন বা দূষণের জন্য, বিজিগীষু যে বিচার বা তর্কের প্রবর্তন করা হয়, তার নাম বিতণ্ডা। এটি একটি বিশেষ বিচার প্রক্রিয়া।

জল্প ও বিতণ্ডাতে প্রতিপক্ষের পরাজয়ের জন্য ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থানের উদ্ভাবন করা যেতে পারে। বক্তা যে অর্থ প্রকাশের অভিপ্রায়ে বাক্য প্রয়োগ করেন, তার বিপরীত অর্থ কল্পনা করে দোষ উদ্ভাবনের নাম ছল। ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করে কেবল স্বধর্ম বা বৈধর্ম্য বলে যে দোষোদ্ভাবন করা হয় তার নাম জাতি। যার দ্বারা বিচারকারীর বিপরীত জ্ঞান অথবা প্রকৃত বিষয়ে অজ্ঞানতা প্রকাশ পায় তার নাম নিগ্রহস্থান।

চার্বাক সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে জানা যায় চার্বাক দর্শন সংস্কারমুক্ত, উদার এবং প্রগতিশীল চিন্তার ধারক ও বাহক। কাম্য বস্তুই এখানে শ্রেয়।[৮৯] সুখবাদী চার্বাকগণের মতে সুখভোগের আকাঙ্খাকে সুসংযত করতে না পারলে সুখভোগ অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারা আরও মত দিয়েছেন অবজর্নীয় সুখের সাথে যে দুঃখ এসে পড়ে তাকে মেনে সুখ ভোগ করতে হয়। প্রয়োজনে ঋণ করে ঘি খাওয়ার পরিস্থিতিকে মেনে নেয়ার কথা বলেছেন তারা। সুখবাদীরা সুখ ও দুঃখ সম্পর্কে চারটি সূত্র প্রণয়ন করেছেন–(ক) যে সুখ দুঃখের কারণ হয় না, তা আদরণীয়; (খ) যে দুঃখ সুখের কারণ হয় না, তা বর্জনীয়; (গ) যে সুখ বৃহত্তর সুখের অন্তরায়, তা বর্জনীয় এবং (খ) যে দুঃখ বৃহত্তর দুঃখ নিবারণ করে অথবা বৃহত্তর দুঃখ বর্জন করে, তা সহনীয়।[৯০] এই কারণে লৌকিক সংস্কৃত ভাষার সাথে বৈদিক ভাষাও তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় ভাষা বিষয়ে চার্বাক সম্প্রদায়ের মনোভাব উদার, সংস্কারমুক্ত এবং প্রগতিশীল। সকল ভাষা, সকল জাতি এবং সকল সংস্কৃতির প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উদার। তবে চার্বাক পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট গ্রন্থগুলি বৈদিক অনুসারীদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে অথবা চার্বাক দর্শন বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই মতবাদ সম্পর্কে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' নামের মাত্র একমাত্র আকর গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থাকারের নাম জয়রাশি ভট্ট। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতকে। চার্বাক নামটি বৈদিক সাহিত্যে দুর্লভ।[৯১] একারণে চার্বাক দর্শনের মৌলিকত্ব নিয়ে রয়েছে অনেক প্রশ্ন। ভারতবর্ষের নমঃশূদ্র অধ্যুষিত এলাকায় ব্রাহ্মণ্যবাদী অবস্থানে মতুয়া সম্প্রদায়ের একটি জোরালো ভূমিকা আছে। পরবর্তী অংশে এই ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

৫.৭ মতুয়া সম্প্রদায়

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন ফরিদপুর জেলায় (বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলায়) 'মতুয়া' নামের লোকধর্ম উৎপত্তি লাভ করে। এই ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৯) ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ই মার্চ (মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি বুধবার ২৯ শে ফাল্গুন ১২১৮ বঙ্গাব্দ) গোপালগঞ্জ জেলার সফলাডাঙ্গা গ্রামে এক নমঃশূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৯২] তিনি পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী ওড়াকান্দি গ্রামে তাঁর সাধন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

মত্ত বা মাতোয়ারা থেকে 'মতুয়া' শব্দের উৎপত্তি। যারা হরিনামে ও হরিপ্রেমে মাতোয়ারা তারাই মতুয়া। ভক্তের নিকট হরিচাঁদ ঠাকুর 'পূর্ণব্রহ্ম' ও 'যুগাবতার'। তিনি নিজেকে চৈতন্যদেব ও গৌতম বুদ্ধের অণু অবতার বলে দাবি করেন। এই ধর্মের উদ্ভবের সাথেও রয়েছে তাঁর স্ব-শ্রেণির আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার ইতিহাস। তিনি নিজেই তাঁর তরুণ বয়সে স্থানীয় জমিদার সূর্যমণি মজুমদার কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি হারিয়ে বাস্তুত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য বাড়ি বাড়ি সদাই ফেরি করে বিক্রির পেশা গ্রহণ করেন। পূর্ব পুরুষের বাস্তু থেকে উচ্ছেদ, কৃষি জমি ও কৃষি কাজ থেকে বঞ্চিত হওয়া প্রভৃতি ঘটনা তাঁর মনে প্রবলভাবে দাগ কাটে এবং তিনি বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মান্দোলনে ব্রতী হন।

মতুয়া ধর্মের উদ্ভবের সাথে লোকায়ত ঐতিহ্য পরম্পরা সম্পর্কযুক্ত। সমাজের অধিকার বঞ্চিত মানুষের সামাজিক বঞ্চনাকে অবলম্বন করেই শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদের নেতৃত্বে মতুয়া ধর্মান্দোলন ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে একটি নতুন ধারার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। মতুয়া ধর্মের উদ্ভব হয় উনবিংশ শতাব্দী ও পূর্বেকার সামাজিক পটভূমি ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে। উচ্চবর্গীয় ধর্মীয় শাস্ত্র ও সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক রীতি-নীতির প্রতি অনাস্থা পোষণ করেই মতুয়া ধর্মের উদ্ভব। নিপীড়িত মানুষের জীবনকে আশ্রয় করে ও তার বাস্তববাদী আকাঙ্খাকে ধারণ করে মতুয়া ধর্মের বিকাশ। এই ধর্মের উদ্ভব কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। দলিত মানুষের লোকায়ত পরম্পরায় সামাজিক

ভেদ নীতির বিরচদ্ধে যে দ্রোহ সক্রিয় থাকে তারই ফলশ্রচতি মতুয়া ধর্ম। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রমজীবী বঞ্চিত মানুষের সামাজিক উন্নয়ন ও ধর্মীয় জীবনে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খাকে ধারণ করে হরিচাঁদ ঠাকুরের অধ্যাত্ম চিন্তার বহি:প্রকাশ। তিনি এই চিন্তার মধ্য দিয়ে যে সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করেন হরিচাঁদ পুত্র গুরচচাঁদ ঠাকুর সেই আন্দোলনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দেন। তাঁরা তাদের কর্ম ও সাধনার মাধ্যমে অধ্যাত্মভাবনাকে সামাজিক সংকীর্ণতা, বিকৃতি ও শ্রেণি ভেদহীনতার মধ্য দিয়ে গতিশীল করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল অধ্যাত্মভাবনার আচ্ছাদনে আর্থ-সামাজিক অবিচার অনাচারের বিরচদ্ধে শ্রমজীবী মানুষদেরকে সংগঠিত করা। মতুয়া আদর্শের সাথে পশ্চাৎপদ সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের চেষ্টা বিদ্যমান। প্রাথমিকভাবে নমঃশূদ্র সমাজকে আশ্রয় করে এই ধর্মের সূচনা হলেও পরবর্তীতে এটি বাংলাদেশের সমগ্র অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক মুক্তির আকাঙ্খাকে ধারণ করতে সমর্থ হয় এবং ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সমগ্র প্রান্তিক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

মতুয়া ধর্ম দলিত-নিপীড়িত মানুষের মনন উত্থিত ও চেতনাজাত প্রতিবাদী ধর্ম। সমাজের নীচের থাকে অবস্থানরত মানুষ তাদের সমস্তরকম বঞ্চনাকে মোকাবেলা করার অভিপ্রায়ে মতুয়া ধর্মের পতাকা তলে এসে দাঁড়ায়। তাদের গণ জমায়েতের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদ ছিল। এই প্রসঙ্গে ফোকলোরবিদ ড. তুষার চট্টোপাধ্যয় বলেন-

> Hari Chand Thakur and the doctrine of Matua brought a raising in the Namasudra community against the age old hierarchic Brahminical prescription and the socio-economic exploitation. The prime credit of Harichand Thakur and his successors is to eneate self confidence in the community and it uplift those who were neglegted and backward under the presure of different socio-historical cross-currents.[৯৩]

মতুয়া ধর্ম বৈষ্ণব ধর্মের কোনো শাখা নয়। যদিও হরিচাঁদ ঠাকুরকে মতুয়ারা চৈতন্যের অণু অবতার বলে মান্য করে। মতুয়ারা মনে করে, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার নামে ধর্মীয় জীবনে যে অনাচার-বিকৃতি দেখা দেয় এবং নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব চর্চার নামে স্বাভাবিক যৌন জীবন অবদমনের মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য পালন করে জীবন যাত্রার স্বাভাবিকতা নষ্ট করার যে প্রবণতা সমাজে আচরিত হতে থাকে, হরিচাঁদ ঠাকুর তার বিপরীতে গার্হস্থ্য ধর্মের প্রবর্তন করেন। চৈতন্যদেবের অবর্তমানে বৈষ্ণবধর্মে যে অনিয়ম প্রবেশ করে তা ঘুচাতে শ্রীচৈতন্যের হরিচাঁদ রূপে আবির্ভাব। তাঁদের মান্যগ্রন্থে উল্লখ আছে-

> সুবিশুদ্ধ প্রেম দান গৌরাঙ্গ লীলায়।
> সে প্রেম শোষিল প্রায় কলির মায়ায়।
> এই রূপে বৈষ্ণব ধর্মে পড়ে গেল ত্রচটি।
> সেহেতু ঘুচাতে বৈষ্ণবের কুটিনাটি।
> বৈষ্ণবের কুটিনাটি খণ্ডনের কারণ
> সে কারণে অবতার পুণঃ প্রয়োজন।[৯৪]

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় শ্রী চৈতন্য গার্হস্থ ধর্মের আবরণে বিশুদ্ধ মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন। এই কারণে তিনি আবার হরিচাঁদ রূপে পৃথিবীতে অবতার রূপে আবির্ভূত হন; প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন আদর্শ জীবন বিধান সম্বলিত প্রশস্ত গার্হস্থ ধর্ম। এই প্রসঙ্গে নন্দদুলাল মোহন্ত-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন-

> ...মতুয়া ধর্ম সংকীর্ণ জাতপাতের তুচ্ছতা বা তথাকথিত বৈষ্ণব মাধ্যমজাত সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়- মতুয়া ধর্ম উৎসারিত হয়েছে দলিত লোকায়ত বৃহত্তর জনসমাজের আশা-আকাঙ্খাজাত চেতনার প্রসারিত ক্ষেত্র। প্রকৃতপক্ষে এই সত্য কখনও বিশ্রচত হওয়া সম্ভব নয় যে, নমঃশূদ্র তথা দলিত নিপীড়িত জনসমাজকে সর্বহীনম্মন্যতার উর্ধ্বে আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে ঠাকুর শ্রীশ্রীহরি-গুরচচাঁদ লোকায়ত

> ঐতিহ্যের ভিত্তিমূলে সুদৃঢ় থেকেই যুগপ্লাবী বিপ্লবাত্মক মতুয়া ধর্মান্দোলনের পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরেছিলেন।[৯৫]

মতুয়া ধর্ম মতে, গার্হস্থ্য আশ্রম পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাই মতুয়ারা সন্ন্যাস কিংবা ব্রহ্মচর্য পালন করে না। তাঁরা ধর্ম চর্চার নিমিত্তে গৃহত্যাগ কিংবা নারী সংসর্গ এড়িয়ে চলার প্রয়োজন মনে করে না। সংসারে নারী-পুরুষ এক সাথে থেকেই ধর্ম চর্চা করে। তারা মনে করে গার্হস্থ্য কর্মে নিষ্ঠাবান থেকে সন্ন্যাস, বাণ প্রস্থী, ব্রহ্মচারী হওয়া সম্ভব। ধর্ম পালনের জন্য গৃহত্যাগ অবান্তর। গৃহে থেকেই সন্ন্যাস কিংবা ব্রহ্মচারী হওয়া যায়। তাঁদের ভাষ্য মতে-

> করিবে গৃহস্থ ধর্ম লয়ে নিজ নারী।
> গৃহে থেকে ন্যাসী বানপ্রস্থী ব্রহ্মচারী।[৯৬]

গৃহে থেকে ধর্ম চর্চায় মনোনিবেশ করে ধর্ম চর্চায় যথার্থতা লাভ করা সম্ভব বলেই চৈতন্যদেব নিজে সন্ন্যাস ব্রত পালন করেও নিত্যানন্দকে গার্হস্থ্য ধর্ম পালনে উৎসাহিত করেন, এই বিশ্বাস মতুয়াদের মধ্যে প্রবল। তাঁরা মনে করে, চৈতন্যদেব নিম্নকুলে অবতার হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর শেষ লীলা সমাপ্ত করেছেন। শ্রীহরির তথাকথিত নিম্নবর্ণে জন্ম নেওয়ার যৌক্তিকতা সম্পর্কেও মতুয়াদের রয়েছে নিজস্ব মত। অবতারের আবির্ভাবের পরিক্রমায় উচ্চ কুলের যে গৌরব তার ব্যতিক্রম ঘটলো হরিচাঁদ ঠাকুরের জবানিতে। মতুয়ারা তাদের অধ্যাত্ম গুরুর এই বাণীকে আত্মস্বীকৃতিতে ব্যবহার করে। যাজকের সেই বাণীকে স্মরণ করে মতুয়া সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে-

> নীচ হয়ে করিব যে নীচের উদ্ধার
> অতি নিম্নে না নামিলে কিসে অবতার।
> কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল উচ্চেতে না রবে।
> নিম্ন খাদে থাকে বারি দেখ মনে ভেবে।[৯৭]

মতুয়া ধর্ম হরিচাঁদ ঠাকুরের হাত ধরে আবির্ভূত হয়। আর হরিচাঁদ পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর এই ধর্মের প্রচার প্রসার সাধন করেন। মতুয়াদের নিকট গুরুচাঁদ পতিত পাবন রূপে পূজ্য হন। এই ধর্ম সমাজ সংস্কার, শিক্ষা প্রসার, জমিদার প্রথার বিরুদ্ধাচরণ, তেভাগা আন্দোলন, প্রভৃতি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। শ্রমজীবীর অধিকার সচেতনতায় মতুয়া ধর্ম ছিল অগ্রণী। সামাজিক ও ধর্মীয় আচারে তাঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌরহীত্য, হোম, যজ্ঞ,গঙ্গা জলের মাহাত্ম্য, জাতিশ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে। গুরুর প্রতি ভক্তি নিবেদনের স্বীকৃতি আছে। তবে দেব-দ্বিজে ভক্তি অস্বীকৃত। মতুয়ারা ধর্মগুরুদের গোঁসাই বা পাগল বলে সম্বোধন করে। ওড়াকান্দিকে তাঁরা তীর্থস্থান বলে মান্য করে। প্রতি বছর বারুনী উৎসবে মতুয়া ভক্তরা ডংকা, লাল নিশান, সাদা নিশান নিয়ে সেখানে সমবেত হয়।

মতুয়াদের সাধনার মাধ্যম ও অঙ্গ হলো সাধন সঙ্গীত চর্চা। তাঁদের মধ্যে অজস্র সাধন সঙ্গীত প্রচলিত। এছাড়া হরিযাত্রা, বালাগান, অষ্টক গান, জীবনীকাব্য, পালাকীর্তন, কবিগান, শ্লোক, পাঁচালি প্রভৃতি সাহিত্য মতুয়া ধর্মকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে এবং মতুয়া সমাজে এগুলো চর্চা হতে দেখা যায়। তাঁরা হরিচাঁদের দ্বাদশ আজ্ঞা মেনে চলে। বুধবারকে পবিত্র মনে করে। তারা আমিষ ভোজী। তারা ছাগলের মাংস খাওয়া ও কালীপজোয় পাঠা বলি দেওয়র প্রতি অনেক রকম বিধি নিষেধ আরোপ করে। কেউ কেউ ছাগলের মাংস একেবারেই খায় না। শিক্ষাগ্রহণ, বিদ্যাচর্চা ও পরিচ্ছন্নতাকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করে। মতুয়া ধর্ম বর্তমানে উপমহাদেশের সবচেয়ে সংখ্যাগুরু অনুসারী আচরিত

লৌকিক ধর্মীয় ধারা। বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহত্তম ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, বৃহত্তর যশোর, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলায় মতুয়াদের অবস্থান লক্ষণীয়। মতুয়া ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে মন্তব্য করেন-

> চিত্তবিস্ফোরণ যদি রেনেসাঁসের মূল বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে বলা যায় শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব ও মতুয়া ধর্মান্দোলন নিম্নবঙ্গের দলিত সমাজে যথার্থ জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। মতুয়া ধর্মান্দোলনের প্রভাবে যেমন একদিকে নিপীড়িত মানুষের চেতনার সম্প্রসারণ হয়েছে তেমনি অন্যদিকে দলিত সমাজের সাহিত্য, ধর্ম-সাধনা ও দৈনন্দিন আচার-আচরণ প্রভৃতি উপেক্ষার অগৌরব থেকে আত্মরক্ষা করছে।[৯৮]

বর্তমানে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের নমঃশূদ্র, কাপালি, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, জেলে, নরসুন্দর, কামার, কুমার, তাঁতি, বাঙালি খ্রিস্টান, মুসলমান কৃষক প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুসারী। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে নিম্ন বর্ণের অনেক মানুষ খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মীয় প্রচারের ফলে ও আর্থ-সামাজিক সুবিধা প্রাপ্তির আশায় খ্রিস্টান হলেও তাঁরা মতুয়া ধর্মকে ত্যাগ করতে পারেনি। তাই ওড়াকান্দি, জয়পুর, লক্ষ্মীখালি, হুড়কা প্রভৃতি স্থানের বাৎসরিক মহোৎসবে তাঁদের সদলবলে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। আবার ফরিদপুর-বরিশাল-পিরোজপুর অঞ্চলের মুসলমান কৃষকদের মধ্যে মতুয়া ধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়। পরবর্তী অধ্যায়ে মতুয়া সম্প্রদায়ের উপর প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হবে। তবে তার আগে মতুয়া সম্প্রদায়ের সাথে সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ, কতাভজা সম্প্রদায়, ব্রাহ্ম সমাজ এবং চার্বাক দর্শনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিষয়ে ৬ টি সারণি পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হল।

তথ্যপঞ্জি

১. শ্রী পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য, mdx g‡Zi mÜv‡b, কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা, ১৯৮৯, পৃ. ৪১।

২. মুহাম্মদ এনামুল হক, e‡½ ¯dx cfve, ঢাকাঃ র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ১২৯-১৩০

৩. আবদুল ওয়াহাব, evsjv‡'‡ki †jvKMxwZ : GKwU mgvRZwËK Aa¨qb; দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৯, পৃ. ৬৭।

৪. রামদুলাল রায়, evOvjxi 'kb : cvPxbKvj †_‡K mv¤cwZK Kvj, ঢাকাঃ উপমা প্রকাশন, ২০১১, পৃ. ১৮১।

৫. রামদুলাল রায়, বাঙালীর দর্শন : প্রাচীনকাল থেকে সাম্প্রতিক কাল, ঢাকাঃ উপমা প্রকাশন, ২০১১, পৃ. ২০২।

৬. রামদুলাল রায়, evOvjxi 'kb : cvPxbKvj †_‡K mv¤cwZK Kvj, ঢাকাঃ উপমা প্রকাশন, ২০১১, পৃ.২০২।

৭. অনুপম হীরা মন্ডল, evsjv‡'‡ki †jvKag: 'kb I mgvRZË, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ.১৯৬।

৮. আমিনুল ইসলাম, evsjvq gigx 'kb : evDjev' I mwdev', খান শামসুজ্জামান, সম, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ৬৫।

৯. আমিনুল ইসলাম, evsjvq gigx 'kb : evDjev' I mwdev', খান শামসুজ্জামান, (সম.) বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

১০. আশরাফ সিদ্দিকী, 'শ্রী চৈতন্য ও বাংলা সাহিত্য', সূত্রধর, বাবুল চন্দ্র, সম, wmwׄ: kx kx M‡Yk cRv, ঢাকাঃ শ্রী শ্রী গণপতি পূজা উদযাপন পরিষদ, ১৪১৮ বাং, পৃ. ১৫।

১১. সুবির কুমার পাল দেব মহন্ত, KZvfRv mZ¨ ag: mZxgv I mZ¨ 'kb, কলকাতাঃ কল্যাণী ঘোষপাড়া মিলন তীর্থ, ১৪১৮ বাং, পৃ. ৭৬।

১২. John J & Gerber Macionis, Linda M, *Sociology,* Toranto: Prentice Hall, 2002, P. 484.

১৩. রামদুলাল রায়, evDjxi 'kb : cvPxbKvj †_‡K mvg¤cwZK Kvj, ঢাকাঃ উপমা প্রকাশন, ২০১১, পৃ. ১৭৫।

১৪. সুবির কুমার পাল দেব মহন্ত,KZvfRv mZ¨ ag: mZxgv I mZ¨ 'kb, কলকাতাঃ কল্যাণী ঘোষপাড়া মিলন তীর্থ, ১৪১৮ বাং, পৃ. ১৩।

১৫. আবদুল ওয়াহাব, evsjv‡'‡ki †jvKMxwZ : GKwU mgvRZwËK Aa¨qb; দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৯, পৃ. ১১০।

১৬. সুবির কুমার পাল দেব মহন্ত,KZvfRv mZ¨ ag: mZxgv I mZ¨ 'kb, কলকাতাঃ কল্যাণী ঘোষপাড়া মিলন তীর্থ, ১৪১৮ বাং, পৃ. ৭৬।

১৭. আনোয়ারুল করীম, evDj mvwnZ¨ I evDj Mvb, ঢাকাঃ লোক সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৭১, পৃ. ৪৩।

১৮. শক্তিনাথ ঝা, e¯ev'x evDj, কোলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯, পৃ. ৪৫০।

১৯. আবদুল ওয়াহাব, evsjv‡'‡ki †jvKMxwZ : GKwU mgvRZwËK Aa¨qb; দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ১৭৩।

২০. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, evsjvi evDj I evDj Mvb, কলকাতাঃ ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, ১৯৭১, পৃ. ১২৯।

২১. শক্তিনাথ ঝা, e¯ev'x evDj, কোলকাতাঃ লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯, পৃ. ৪৫০।

২২. আহমেদ শরীফ, ২০০৩। evDj ZË, ঢাকাঃ পড়ুয়া, শরীফ, পৃ. ৪১।

২৩. সুধীর চক্রবর্তী, Mfxi wbRb c‡_, কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫, পৃ. ১৬।

২৪. আবদুল ওয়াহাব, evsjv‡'‡ki †jvKMxwZ : GKwU mgvRZwËK Aa¨qb; দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৯, পৃ. ১২৫।

২৫. আবদুল ওয়াহাব, evsjv‡'‡ki †jvKMxwZ : GKwU mgvRZwËK Aa¨qb; দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৯, পৃ. ১২২।

২৬. সেলিম জাহাঙ্গীর, MvDmj AvRg gvBRfvÐvix kZe‡li Av‡jv‡K, চট্টগ্রাম, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভণ্ডারী, ২০০৭, পৃ. ১০৮।

২৭. সুকান্ত পাল, cm½: †jvKm½xZ, কোলকাতা, গণমন প্রকাশন, ১৯৯৫, পৃ. ১২-১৩।

২৮. মুহাম্মদ আবু তালিব, Ôjvjb Pwi‡Zi Dcv'vbÕ, হক, খন্দকার রিয়াজুল, সম jvjb mvwnZ¨ I 'kb, ঢাকাঃ সাহিত্যিকা, ২০০৩, পৃ. ১-৪৪।

২৯. অনুপম হীরা মন্ডল, evsjv‡'‡ki †jvKag: 'kb I mgvRZË, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ. ৫১।

৩০. সুধীর চক্রবর্তী, Mfxi wbRb c‡_, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮, পৃ. ৪৮।

৩১. মুহাম্মদ এনামুল হক, e‡½ ¯দx cfve, ঢাকা, র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ১২৯-১৩০।

৩২. আবদুল ওয়াহাব, evsjv‡'‡ki †jvKMxwZ : GKwU mgvRZvwËK Aa¨vqb; দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৯, পৃ. ১২৫।

৩৩. বাবুল চন্দ্র সুত্রধর, 'সাম্য-সংস্কৃতি', বাবুল চন্দ্র সূত্রধর (সম), wmwx: kx kx M‡Yk cRv, ঢাকা, শ্রী শ্রী গণপতি পূজা উদযাপন পরিষদ, ১৪১৮ বাং, পৃ. ৫৬।

৩৪. অনুপম হীরা মণ্ডল, evsjv‡'‡ki †jvKag: 'kb I mgvRZË, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ. ২০।

৩৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, evsjvi evDj I evDj Mvb, কলকাতাঃ ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, ১৩৮৮ বাং, পৃ. ৪০।

৩৬. অক্ষয় কুমার দত্ত, fviZelxq DcvmK m¤cª'vq, ১ম খন্ড, কলকাতাঃ করুণা প্রকাশনী, ১৪১৫ বাং।

৩৭. পাগল চাঁদ ঠাকুর, KZvfRv m¤cª'vq I mZ¨ 'kb, যশোরঃ মিলনতীর্থ, ২০১০, পৃ. ১৬৪।

৩৮. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, evsjvi evDj I evDj Mvb, কলকাতাঃ ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, ১৩৮৮ বাং, পৃ. ৪০।

৩৯. রতন কুমার নন্দী, KZvfRv ag I mwnZ¨, কলকাতা : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯, পৃ. ১৩।

৪০. রতন কুমার নন্দী, KZvfRv ag I mwnZ¨, কলকাতা : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯, পৃ. ১৯ ।

৪১. সত্য সদানন্দ সরদার, dwKi wkweivg VvKi I KZvfRv ag©, যশোরঃ শিবরাম মহন্ত নিত্যধাম, পৃ. ভূমিকা, ২০০৫।

৪২. পাগল চাঁদ ঠাকুর, KZvfRv m¤cª'vq I mZ¨ 'kb, যশোরঃ মিলনতীর্থ, ২০১০, পৃ. ৬১।

৪৩. সত্য সদানন্দ সরদার, mZ¨ a‡gi mZ¨ AvBb, যশোরঃ শিবরাম মহন্ত নিত্যধাম, ২০০৪, পৃ. ২১।

৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, mÂwqZv, ঢাকা, টুম্পা প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ৩৪৭।

৪৫. সূত্রধর, বাবুল চন্দ্র (২০১৫), Avgvi m¨vi isMjvj †mb, সমাজ নিরীক্ষণ (বোরহাউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত), ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, জানুয়ারী-মার্চ সংখ্যা।

৪৬. মোঃ আব্দুল হাই তালুকদার, "উনিশ শতকে বাংলায় মানবতাবাদী চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড," শরীফ হারুন সম্পাদিত, evsj‡'‡k 'kbt HwZn¨ I cKwZ AbmÜvb, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮২।

৪৭. বাবুল চন্দ্র সূত্রধর, 'মানবতাবাদ ও মানবাধিকারঃ রংগলাল সেনের অন্তর্দৃষ্টি,' mgvRex ÿY:RvZxq Aa¨vcK isMjvj †mb msL¨v, (গোপাল চন্দ্র সরদার সম্পাদিত), সাতক্ষীরা, সমাজবীক্ষণ গবেষণা কেন্দ্র, জুলাই ২০১৫, পৃ.৫৭-৫৮।

৪৮. বাবুল চন্দ্র সূত্রধর,'সাম্য-সংস্কৃতি' wmwx t kx kx M‡Yk cRv (বাবুল চন্দ্র সূত্রধর সম্পাদিত), বাংলাদেশ, শ্রী শ্রী গণপতি পূজা উদযাপন পরিষদ, ১৪৯৮ বাং,পৃ.৫১।

৪৯. Mason, Jenifer (2003), *Quallitative Researching,* London Sage, 2000, p. 149, Rahman, *Urban Policy in Bangladesh: The State Inequality and Housing Crices in Dhaka City,* Alberta: Calgary, P. 155-160.

৫০. বাবুল চন্দ্র সূত্রধর, 'মানবতাবাদ ও মানবাধিকারঃ রংগলাল সেনের অন্তর্দৃষ্টি,' mgvRex ÿ Y:RvZxq Aa¨vcK isMjvj †mb msL¨v, (গোপাল চন্দ্র সরদার সম্পাদিত), সাতক্ষীরা, সমাজবীক্ষণ গবেষণা কেন্দ্র, জুলাই ২০১৫, পৃ.৫৭-৫৮।

৫১. রামদুলার রায়, বাঙালির দর্শনঃ প্রাচীকাল থেকে সাম্প্রতিক কাল,ঢাকা, উমাূকাশন, ২০১১, পৃ.২৩৫।

৫২. https://www.facebook.com/permalink.php?id=1661747960706215, 23/09/2016

৫৩. মোঃ হুমায়ন কবীর ও অন্যান্য, a"c'x mgvRweÁv‡bi ZË, ঢাকা, লেখাপড়া, ২০১৫, পৃ. ১০।

৫৪. hps:// bn. wikipedia. org/ wiki/ব্রাহ্মধর্ম, ১৯/০৯/২০১৬ ইং।

৫৫. রামদুলাল রায়, evOvjxi 'kbt cvPxbKvj †_‡K mv¤úwZK Kvj, ঢাকা, উপমা প্রকাশন, ২০১১, পৃ.২৩৯-২৪৪।

৫৬. মোঃ হুমায়ন কবীর ও অন্যান্য, a"c'x mgvRweÁv‡bi ZË, ঢাকা, লেখাপড়া, ২০১৫, পৃ. ৯০।

৫৭. রামদুলাল রায়, evOvjxi 'kbt cvPxbKvj †_‡K mv¤úwZK Kvj, ঢাকা, উপমা প্রকাশন, ২০১১, পৃ.২৩৯-২৪৫।

৫৮. এস. এম. মোঃ নূর নবী, weWUk fvi‡Zi ivR‰bwZK I mvsweawbK Dbqb (1757-1947), ঢাকা, লেখাপড়া২০১৩, পৃ.৮২।

৫৯. এস. এম. মোঃ নূর নবী, weWUk fvi‡Zi ivR‰bwZK I mvsweawbK Dbqb (1757-1947), ঢাকা, লেখাপড়া২০১৩,.৮২।

৬০. এস. এম. মোঃ নূর নবী, weWUk fvi‡Zi ivR‰bwZK I mvsweawbK Dbqb (1757-1947), ঢাকা, লেখাপড়া২০১৩, পৃ.৮৩।

৬১. মতিউর রহমান, evOwji 'kbt gvbl I mgvR, ঢাকা, বংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ.২২৪।

৬২. মতিউর রহমান, evOwji 'kbt gvbl I mgvR, ঢাকা, বংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ.২৪৪।

৬৩. বাবুল চন্দ্র সূত্রধর, 'মানবতাবাদ ও মানবাধিকারঃ রংগলাল সেনের অন্তর্দৃষ্টি,' mgvRex ÿ Y:RvZxq Aa¨vcK isMjvj †mb msL¨v, (গোপাল চন্দ্র সরদার সম্পাদিত), সাতক্ষীরা, সমাজবীক্ষণ গবেষণা কেন্দ্র, জুলাই ২০১৫, পৃ.৫৬।

৬৪. মতিউর রহমান, evOwji 'kbt gvbl I mgvR, ঢাকা, বংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ.২৪৬।

৬৫. রামদুলাল রায়, evOvjxi 'kbt cvPxbKvj †_‡K mv¤úwZK Kvj, ঢাকা, উপমা প্রকাশন, ২০১১, পৃ.২৪১।

৬৬. S.K. Dey, *Bengali Lierature in the Nineteenh century,* Kolkata, 1982, p. 606.

৬৭. রামদুলাল রায়, evOvjxi 'kbt cvPxbKvj †_‡K mv¤úwZK Kvj, ঢাকা, উপমা প্রকাশন, ২০১১, পৃ.২৪৩।

৬৮. হিরেন সরকার, ¯Mxq eRm›'i wgÎ, ঢাকা, ১৯১৫, পৃ. ১১।

৬৯. রামদুলাল রায়, evOvjxi 'kbt cvPxbKvj †_‡K mv¤úwZK Kvj, ঢাকা, উপমা প্রকাশন, ২০১১, পৃ.২৪৩-২৪৪।

৭০. রামদুলাল রায়, evO¨jxi ‘kbt cvPxbKvj †_‡K mv¤úªwZK Kvj, ঢাকা, উপমা প্রকাশন, ২০১১, পৃ. ২৪৪।

৭১. Sivnath Sastri, *History of Brahmo Samaj*, Kolkata, 1912, p. 367.

৭২. রমাকান্ত চক্রবর্তী, e‡½ ˆeòe ag, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ. ১৩৭।

৭৩. অনুপম হীরা মণ্ডল, evsjv‡‘‡ki †jvKag, ‘kb I mgvRZË, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ.৯৬।

৭৪. লতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, PvevK ‘kb, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স,২০০৮, পৃ. ১ ।

৭৫. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ. ১৫২।

৭৬. লতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, PvevK ‘kb, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স,২০০৮, পৃ. ৫-৬ ।

৭৭. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ. ৯২, ১৭০।

৭৮. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ. ১১৮।

৭৯. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ. ১০৩, ১০৪।

৮০. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ. ১৪৩।

৮১. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ. ১১৫।

৮২. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩,পৃ. ১১৪,১৪৮,১৪৯,১৫০।

৮৩. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ. ৯৪।

৮৪. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ. ৯৬।

৮৫. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ. ১২৪।

৮৬. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ. ১২৪।

৮৭. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ. ১৩৫।

৮৮. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ. ১৩৬।

৮৯. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ.১৩৭,১৩৮, ১৩৯।

৯০. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ. ৮০

৯১. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, PvevK ‘kb, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০১৩, পৃ. ৮০

৯২. তারক চন্দ্র সরকার, kxkxnwi jxjvgZ, ওড়াকান্দি, ঠাকুর বাড়ি, ১৯৯৭, পৃ.১১৬।

৯৩. উদ্ধৃতি; অনুপম হীরা মণ্ডল, evsj‡‘‡ki †jvKag, ‘kb I mgvRZË, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ. ৯৩-৯৪।

৯৪. তারক চন্দ্র সরকার, kxkxnwi jxjvgZ, ওড়াকান্দি, ঠাকুর বাড়ি, ১৯৯০, পৃ.৭।

৯৫. নন্দ দুলাল মোহান্ত, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, কলকাতা, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ২০০২, পৃ.২৬।

৯৬. তারক চন্দ্র সরকার, kxkxnwi jxjvgZ, ওড়াকান্দি, ঠাকুর বাড়ি, ১৯৯০, পৃ.৮।

৯৭. তারক চন্দ্র সরকার, kxkxnwi jxjvgZ, ওড়াকান্দি, ঠাকুর বাড়ি, ১৯৯০, পৃ.৮।

৯৮. বিরাট বৈরাগ্য, gZqv mwnZ¨ cwiµgv, নদীয়া, ধরমপুর, ১৯৯৯।

সারণি-৩

মতুয়া সম্প্রদায় ও সুফিবাদ ঃ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

সাদৃশ্য	বৈসাদৃশ্য
• মতুয়া সম্প্রদায় ও সুফিবাদ গুরুবাদে বিশ্বাস করে।	• অন্যদিকে মতুয়া সম্প্রদায় বাংলার গুরুবাদ এবং সুফিবাদ পারস্যের গুরুবাদ রূপে আত্মপ্রকাশ করে।
• মতুয়া সম্প্রাদয় ও সুফিবাদ নাচ, গান ও সংগীতের সমর্থক।	• মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ গুরু ঈশ্বরজ্ঞানে উপাস্য আর সুফিবাদে মানুষ গুরু ঈশ্বরের পথ প্রদর্শক।
• উভয় মতবাদই ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী।	• মতুয়া সম্প্রদায়ে ভারতীয় মূল্যবোধ এবং সুফিবাদে ইসলামী মূল্যবোধ প্রাধন্য পেয়েছে।
• উভয় মতবাদেই হিন্দু-মুসলমান ভক্ত রয়েছে।	• মতুয়া সম্প্রদায় সাকার উপসনা করে এবং সুফিবাদ নিরাকার উপাসনায় বিশ্বাস করে।
• মতুয়া সম্প্রদায় ও সুফিবাদ পারিবারিক জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে ধর্ম পালনে বিশ্বাসী।	• মতুয়া সম্প্রদায়ে অন্তর্গোত্র বিবাহরীতি প্রচলিত আর সুফিবাদে অন্তর্গোত্র ও বহির্গোত্র দু'রকম বিবাহই স্বীকৃত।
• উভয় সম্প্রদায়ই মানুষকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে।	• মতুয়া সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে জাতিবর্ণ প্রথার প্রতিবাদ জানানোর মধ্য দিয়ে। আর সুফিবাদ আত্মপ্রকাশ করে ইসলামের গোঁড়ামীপনার প্রতিবাদ জানাতে।

সারণি-৪

মতুয়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণববাদ ঃ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

সাদৃশ্য	বৈসাদৃশ্য
• মতুয়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণববাদ সংগীতাশ্রয়ী	• বৈষ্ণব সংগীত পরিবেশনে শ্রী চৈতান্যের মাহাত্ম প্রকাশ পায়; পক্ষান্তরে মতুয়া সংগীতে শ্রী শ্রী হরি-গুরুচ্চাঁদের মাহাত্ম পরিবেশিত হয়।
• উভয় সম্প্রদায় অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী চেতনায় বিশ্বাস করে।	• মতুয়া সম্প্রদায় মতুয়া মহাসংঘ, মতুয়া মিশন এবং বিশ্ব মতুয়া পরিষদে বিভক্ত, পক্ষান্তরে বৈষ্ণব সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও সহজিয়া বৈষ্ণব-এ দুভাগে বিভক্ত।
• উচ্চবর্গ আরোপিত নিপীড়নের প্রতিবাদ জানাতে মতুয়া সম্প্রাদায় ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে।	• বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে না পারলেও মতুয়ারা সেখানে স্বতন্ত্র গুরুবাদ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে।
• মতুয়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব মতবাদে মানুষকে মূল উপাস্য হিসেবে গণ্য করা হয়।	• মতুয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর যাকে মতুয়ারা শ্রী চৈতন্যের অনু অবতর মনে করে; পক্ষান্তরে বৈষ্ণববাদের উদ্ভাবক শ্রী চৈতন্য হলেও বৈষ্ণবরা এদেরকে স্বীকার করে না।
• সাধন ভজনে উভয় সম্প্রদায়ই যৌগিক সাধনার উপর গুরুত্বারোপ করেছে।	• বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হওয়ার পরে সন্যাস গ্রহণে গুরচত্বারোপ করা হয়। কিন্তু মতুয়া মতে সংসারে আবদ্ধ থেকেই ধর্ম পালন শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।
• মতুয়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় আবির্ভূত ও বিকশিত হয় ভারতবর্ষের বাংলা অঞ্চলে।	• মতুয়া সম্প্রদায়ে প্রচুর সংখ্যক মুসলমান ভক্ত থাকলেও বৈষ্ণব ধর্মে সে সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

সারণি-৫

মতুয়া সম্প্রদায় ও বাউল মতবাদ ঃ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

সাদৃশ্য	বৈসাদৃশ্য
• মতুয়া সম্প্রদায় ও বাউল মতবাদ গুরুবাদে বিশ্বাস করে।	• সংগীত পরিবেশনে বাউল ব্যবহার করে একতারা ও ডুগডুগী; পক্ষান্তরে মতুয়ারা ব্যবহার করে ডঙ্কা ও করতাল।
• শাস্ত্রভারমুক্ত চেতনা লালন করে মতুয়া সম্প্রদায় ও বাউল মতবাদ।	• মতুয়াদের উপর বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবাদের প্রভাব বেশি; পক্ষান্তরে বাউল মতবাদে সুফি বৈষ্ণবের প্রভাব লক্ষ করা যায়।
• উচ্চবর্গীয় বৈষম্য এবং সামাজিক নিপীড়নের প্রতিবাদ জানাতে এ দুটি লোকধর্মীয় মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে।	• বাউল দর্শনে মদ, গাঁজাসহ অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করা হলেও মতুয়া সম্প্রদায়ে তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।
• মতুয়া সম্প্রদায় ও বাউল মতবাদ বাংলায় ধর্ম অনুশীলনে গুরূত্বারোপ করে।	• মতুয়াদের মাঝে স্বতন্ত্র গুরুবাদ সৃষ্টির প্রবনতা রয়েছে, পক্ষান্তরে বাউলদের মাঝে এমনটি থাকলেও তা জোরালো নয়।
• দু'টি সম্প্রদায়েই মানুষই আসল উপাস্য। মানব সেবার ব্রত উভয় সম্প্রদায়েই আছে।	• মতুয়া সম্প্রদায় বেশভূষায় সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে; পক্ষান্তরে বাউল সম্প্রদায়ের বেশভূষা স্বতন্ত্র অনুকরণ বলে মনে হয়েছে।
• সাধন ভজনে উভয়েই যোগাভ্যাসে গুরুত্বারোপ করে।	• হরিনামে মাতোয়ারা থাকে তাই মতুয়া; পক্ষান্তরে বায়ুর সাধনা করে তাই বাউল।

সারণি-৬

মতুয়া সম্প্রদায় ও কর্তাভজা সম্প্রদায় ঃ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

সাদৃশ্য	বৈসাদৃশ্য
• মতুয়া সম্প্রদায় ও কর্তাভজা সম্প্রদায় ধর্মীয় প্রার্থনায় সংগীতাশ্রয়ী।	• মতুয়া সম্প্রদায় সংগীত পরিবেশন করে করতাল এবং ডংকার মাধ্যমে; পক্ষান্তরে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সঙ্গীত পরিবেশিত হয় বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই খালি গলায়।
• উভয় সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী চেতনায় বিশ্বাস করে।	• মতুয়া সম্প্রদায় নারী-পুরুষ একত্রে হরিনামে মাতোয়ারা হয়। এটি ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা সমালোচিত। ভগবানিয়া ও ভগবজ্জনে বিভক্ত হয়ে কর্তাভজা সম্প্রদায় স্রষ্টার আরাধনা করে।
• উচ্চবর্গ আরোপিত নিপীড়নের প্রতিবাদ জানাতে মতুয়া সম্প্রাদায় ও কর্তাভজা সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে।	• কর্তাভজা সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে না পারলেও মতুয়ারা সেখানে স্বতন্ত্র গুরুবাদ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। তাদের প্রয়াস এখনও অব্যাহত।
• মতুয়া সম্প্রদায় ও বাউল মতবাদ দুই-ই মানুষকে মূল উপাস্য হিসেবে গণ্য করে।	• মতুয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক হরিচাঁদ ঠাকুর যাকে মতুয়ারা গৌতম বুদ্ধ ও শ্রী চৈতন্যের অনু অবতর মনে করে; পক্ষান্তরে কর্তাভজা সম্প্রদায় আউলচাঁদকে মূল প্রবর্তক মানলেও শ্রী চৈতন্যকেই কেবলমাত্র অণু অবতর হিসেবে স্বীকার করে।
• সাধন ভজনে উভয় সম্প্রদায়ই যৌগিক সাধনার উপর গুরুত্বারোপ করে থাকে।	• কর্তাভজা মতে দীক্ষিত হওয়ার পরে জাতপাতের প্রশ্ন চলে আসে। কিন্তু মতুয়া মতে, দীক্ষার উপর গুরচত্ব হয় না; গুরচত্বারোপ করা হয় প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্মে।
• মতুয়া সম্প্রদায় ও কর্তাভজা সম্প্রদায় আবির্ভূত ও বিকশিত হয় অখন্ড বাংলায়।	• কর্তাভজা সম্প্রদায়ে প্রচুর সংখ্যক মুসলমান থেকে দীক্ষিত লোকজন আছে। একারণে মুসলিম ঘরাণার নামের আধিক্যও প্রবল; পক্ষান্তরে মতুয় সম্প্রদায় মুসলমান ভক্ত থাকলেও দীক্ষিত লোকজন পাওয়া যায় না।

সারণি-৭

মতুয়া সম্প্রদায় ও ব্রাহ্ম আন্দোলন ঃ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

সাদৃশ্য	বৈসাদৃশ্য
• মতুয়া সম্প্রদায় ও ব্রহ্ম আন্দোলন মানবতাবাদী ধর্মীয় ধারা।	• মতুয়া সম্প্রদায় অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর আন্দোলন; পক্ষান্তরে ব্রাহ্ম আন্দোলনে দেখা যায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাধান্য।
• উভয় সম্প্রদায় অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী চেতার আলোকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বিশ্বাস করে।	• মতুয়া সম্প্রাদয় নারী-পুরুষ একত্রে হরিনামে মাতোয়ারা হয়। এজন্য মন্দির অবকাঠামো দরকার হয় না; পক্ষান্তরে ব্রাহ্ম আন্দোলনে মন্দিরে বসে নারী-পুরুষ একত্রে প্রার্থনার রেওয়াজ চালু হয়।
• সমাজ আরোপিত নিপীড়নের প্রতিবাদ জানাতে মতুয়া সম্প্রদায় ও ব্রাহ্ম আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে।	• মতুয়া আন্দোলনে বৌদ্ধবাদ এবং বৈষ্ণববাদের প্রভাব থাকলেও ব্রাহ্ম আন্দোলনে রয়েছে ইউরোপীয় রেঁনেসার প্রভাব।
• মতুয়া সম্প্রদায় ও ব্রাহ্ম আন্দোলন দুই-ই জীবনাচরণে বস্তুবাদী চেতনা লালন করে।	• মতুয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর মানুষ; পক্ষান্তরে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন উচ্চ শ্রেণির ব্রাহ্মণ কুলে আবির্ভূত প্রগতিশীল মানুষ।
• পৌত্তিলকতা বিরোধী, তীর্থ পর্যটন বিরোধী এবং একশ্বরবাদী চেতনার ধারক।	• মতুয়া সম্প্রদায়ে জাতপাতের প্রশ্ন অবান্তর; পক্ষান্তরে ব্রাহ্ম আন্দোলন পুরোপুরি এ জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।
• মতুয়া সম্প্রদায় ও ব্রাহ্ম আন্দোলন বিকশিত হয় ভারতবর্ষের বাংলা ভূখন্ডে।	• মতুয়া সম্প্রদায়ে মুসলমান ভক্তের আনাগোনা থাকলেও ব্রাহ্ম আন্দোলনে এরূপ উপস্থিতির কথা জানা যায় না।

সারণি-৮

মতুয়া সম্প্রদায় ও চার্বাক মতবাদ ঃ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

সাদৃশ্য	বৈসাদৃশ্য
• মতুয়া সম্প্রদায় ও চার্বাক মতবাদ গার্হস্থ্য জীবনাচরণকে প্রাধান্য দিয়েছে।	• মতুয়া সম্প্রদায় পরকালে বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে চার্বাক মতবাদ পরকালের দর্শনে বিশ্বাসী নয়।
• উভয় সম্প্রদায় উচ্চবর্গ বিরোধী অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী চেতনা লালন করে।	• মতুয়া সম্প্রদায় নারী-পুরুষ একত্রে হরিনামে মাতোয়ারা হয় উনবিংশ শতাব্দীতে এসে। পক্ষান্তরে চার্বাক সম্প্রদায় সপ্তম-অষ্টম শতকে বৃহস্পতিকে প্রবর্তক মেনে কেবলমাত্র ইহজাগতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী হয়।
• আর্য সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্যবাদী নিপীড়নের প্রতিবাদ জানাতে মতুয়া সম্প্রাদায় ও চার্বাক মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে।	• মতুয়া সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে না পারলেও চার্বাকরা সেখানে স্বতন্ত্র বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে ভারতবর্ষে।
• মতুয়া সম্প্রদায় ও চার্বাক মতবাদ দুই-ই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা চেতনা বাস্তবায়নে বাঁধা প্রাপ্ত হয়।	• মতুয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক হরিচাঁদ ঠাকুর যাকে মতুয়ারা গৌতমবুদ্ধ ও শ্রী চৈতন্যের অনু অবতর মনে করে; পক্ষান্তরে চার্বাক মতবাদে বৃহস্পতিকে প্রবর্তক মানা হলেও কেউ কেউ অজিত কেশ কম্বলীকেও উদ্যোক্তা হিসেবে স্বীকার করে।
• ইহজাগতিক যোগ্যতা অর্জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছে উভয় সম্প্রদায়।	• মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক দর্শন আছে; পক্ষান্তরে চার্বাক মতবাদে রাজনৈতিক দর্শনের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়।
• মতুয়া সম্প্রদায় ও চর্বাক মতবাদ বিকশিত হয় অখণ্ড ভারতবর্ষে।	• মতুয়া সম্প্রদায় ধর্মান্তররোধে ভূমিকা পালন করে; পক্ষান্তরে চার্বাক মতবাদে ধর্ম বিষয়ে কোনো রকম মাথা ঘামায়নি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে আমি আমার গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করব। পঞ্চম অধ্যায়ে আমি উল্লেখ করেছি মতুয়াবাদে লোকধর্মের প্রভাব। মূলত এ অধ্যায়ে আমি গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ যথাযথভাবে উপস্থাপন করব। তবে প্রাপ্ত তথ্য গবেষণা প্রশ্নের (research question) অলোকে উপস্থাপনের আগে গবেষণালব্ধ তথ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হবে। তাছাড়া গবেষণার তথ্য গবেষণা প্রশ্নের উত্তর সমূহের আকারে উপস্থাপন করব।

মতুয়া সম্প্রদায়ের উপর আমার গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদের কারণে বাঙালি সংস্কৃতিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের আরও একটি শ্রেণি যারা ইসলামের নামে নিপীড়িত হচ্ছিল তারা প্রথমত সুফিবাদে এবং পরবর্তীতে তাদের অনেকেই মতুয়া সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হতে থাকে। এভাবে এদেশের সংস্কৃতিতে একটি নতুন চেতনা বিকশিত হয়। তাদের লালিত সংস্কৃতি মতুয়া সম্প্রদায়কে বিশেষ সম্প্রদায়ে পরিণত করে। তবে মানবতাবাদী দর্শনের কারণে এই সম্প্রদায়টি সুফি, বৈষ্ণব, বাউল, কর্তাভজা, ব্রাহ্ম এবং চার্বাক আন্দোলনের আদর্শিক ভাব ধারার সাথে অনেকাংশে মিলে যায়। এই অর্থে মতুয়া সম্প্রদায় ও অন্যান্য লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তবে এদের মধ্যে মৌলিক তফাৎ হলো মতুয়ারা সুফি, বৈষ্ণব, বাউল, কর্তাভজা, ব্রাহ্ম এবং চার্বাক আন্দোলনের দর্শন গ্রহণপূর্বক পৃথক একটি মতবাদ সৃষ্টি করেছে। শাস্ত্রীয় ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার বাইরে মতুয়ারা সাম্যের সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় যে, খাদ্যাভ্যাস, অসাম্প্রাদয়িক চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষতা স্বতন্ত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মতুয়া সম্প্রদায় লোকধর্মের অঙ্গণে স্বতন্ত্র একটি ধারা তৈরী করেছে। সামাজিকভাবে সাম্যবাদ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য মতুয়া সম্প্রদায়ের রয়েছে নিপীড়িত জনতাকে উজ্জীবিতকরণের স্বপক্ষে অনেক সংগীত। এ সব সঙ্গীতের বেশির ভাগই রচিত হয়েছে উচ্চবর্গ আরোপিত জাতিবর্ণ প্রথার নামে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। তবে সংগীত নির্ভর মতুয়া সম্প্রদায়ের অনেক সংগীত প্রধানত স্রষ্টার আরাধনার নিমিত্তে রচিত হয়েছে। এছাড়া সমাজের মানুষকে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণের জন্যও রয়েছে অনেক সংগীত। এসব সংগীত আমাদের লোকসমাজে দেহতত্ত্ব হিসেবে পরিচিত।

গবেষণার তথ্য থেকে আরও জানা যায় সুফি, বৈষ্ণব, বাউল, কর্তাভজা, ব্রাহ্ম এবং চার্বাক আন্দোলনের সাথে মতুয়াদের যেমন অনেক মিল রয়েছে তেমনি রয়েছে অনেকগুলো অমিল। উত্তরদাতাদের উত্তর থেকে জানা যায় মতুয়া সম্প্রদায় এবং সুফি, বৈষ্ণব, বাউল জনগোষ্ঠী আচারগত ভাবে আলাদা। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের উপর পঞ্চম অধ্যায়ে যে আলোচনা করেছি সে জায়গার সাথে প্রাপ্ত তথ্যে মিল পাওয়া যায়। কোন কোন মতুয়া সদস্যের মধ্যে ইসলামী প্রভাব, কারও মধ্যে সনাতন প্রভাব, কারও মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব আবার কারও মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মতুয়াদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান অথবা খ্রিস্টান চেতনা থাকলেও যে যার চেতনায় সমুজ্জ্বল থেকে স্বতন্ত্র গুরুবাদ লালন করে যাচ্ছে এতে কোন দ্বিমত পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কি এই বিষয়টি নিয়ে মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে কোন রকম নেতিবাচক আলোচনা নেই। মুসলমান সমাজের অনেক রকম আচার ব্যবহার আমি মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের মাঝে লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে সাম্যবাদী চেতনা এবং

একেশ্বরবাদী নীতি; পশ্চাৎপদ বর্ণবাদী ধ্যান-ধারনা তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। আবার কোন কোন মতুয়া সদস্যের মাঝে হিন্দু সম্প্রদায়ের লালিত আচার আচরণের সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আদর্শ ও মূল্যবোধের কিছু কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকল শ্রেণি পেশার মতুয়া জনগোষ্ঠী এক জায়গায় বসে খাওয়া দাওয়া এবং পরমেশ্বরেরর নাম জপ করে। এজন্য সব সময় তারা মন্দিরের প্রয়োজনবোধ করিনি। সুতরাং গবেষণার তথ্যে আরও বোঝা যায় মতুয়া সম্প্রদায় লোকসধর্মের অঙ্গনে অসাম্প্রদায়িক আধ্যাত্মিক চেতনা লালন করছে এবং এই চেতনা সৃষ্টি ও লালন করার জন্য রচিত হয়েছে বিভিন্ন মানবতাবাদী গান। মতুয়া সম্প্রদয়ের কোন কোন উত্তরদাতা এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। কারণ তাদের কোন কোন সংগীত শাস্ত্রীয় ধর্মের অনুরূপ। এই ধরণের অনুভূতি প্রমাণ দেয় তারা শাস্ত্রীয় ধর্মের শাসন এবং তথাকথিত সামাজিক প্রথা, লোকাচার ও লোকবিশ্বাস থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদী ঐতিহ্য থেকে মতুয়ারাও বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। এই কারণে উপস্থাপিত বক্তব্যে উদারতার কথা বলা হলেও তাদের মাঝেও অন্ন পাপ, নব্য জাতি বর্ণ প্রথা, স্বজনপ্রীতি, উপদলীয় প্রভৃতি লক্ষ্য করেছি। তবে মোটামুটিভাবে উত্তরদাতাদের প্রায় সবাই এই ব্যাপারে একমত যে, মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ। গবেষণার তথ্য থেকে আরও মনে হয়েছে মতুয়া সম্প্রদায়ের লৌকিক চেতনা একটি সামাজিক আন্দোলন। এটি সমাজ সংস্কারে ভূমিকা রাখবার জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করলেও বৃহৎ সংস্কৃতির তথাকথিত প্রভাবে সেটি বাঁধা প্রাপ্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। আবার উপদলীয় কোন্দল ও সংস্কার কাজে বিভিন্নভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। যা হোক আমি এখন প্রাসঙ্গিক সাহিত্য আলোচনা, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা প্রশ্নের আলোকে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ গবেষণা প্রশ্নের আলোকে উপস্থাপন করছি।

৬.১ গবেষণা প্রশ্ন-১

কোন প্রেক্ষাপটে মতুয়া সম্প্রদায় বিশেষ সম্প্রদায় হিসেবে আবির্ভূত হয়? এক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষমতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় মতুয়া সম্প্রদায় কিভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি সাম্যবাদী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়?

বিভিন্ন সময়ে সমাজ সংস্কারের জন্য ভারতবর্ষে আবির্ভাব ঘটেছে অনেক মহা পুরুষের। তাদের বক্তব্যে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের প্রতিশ্রুতি থাকলেও দলিত সম্প্রদায় বা অন্ত্যজ শ্রেণির আকাঙ্খার সবটা পূরণ হয়নি। এমতাবস্থায় শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ঊণবিংশ শতাব্দীতে চণ্ডালের ঘরে জন্ম নিয়ে চন্ডালসহ সকল অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন। এ প্রসঙ্গে একজন উত্তরদাতার অভিমত হলো-

> জমিদার নীলকরদের নির্যাতন, খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রচারকদের আগ্রাসন এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী নিপীড়ন চরম পর্যায়ে গেলে মুক্তির জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় [ভরসার জায়গা] দরকার পড়ে। এটি প্রতিবাদের ও শান্তি স্থাপনের। এ কাজের সময়োপযোগী নেতা হরিচাঁদ ঠাকুর। তাঁর সম সাময়িক আরেকটি আন্দোলন ছিল ফরায়েজী আন্দোলন। অশিক্ষিত ও নিরক্ষর সমাজে হরিচাঁদের মতুয়া দর্শনে ধর্মীয় বাণী সংযুক্ত হয় অধিকার আদায়ে।[১]

সাংগঠনিক ও প্রায়োগিক কারণে মতুয়া আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রচারে সৃষ্টি হয় অসংখ্য বাণী। এসব বাণী অত্যাচার, নির্যাতন, জুলুম ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে গণ্য হতে থাকে। সামাজিক ক্ষমতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার

প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে আবির্ভূত হয় মতুয়া সম্প্রদায়। এই প্রসঙ্গে একজন উত্তরদাতা হরিচাঁদ পুত্র গুরচ্চঁদের নাম উল্লেখসহ বলেন,

> আষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা ভূখন্ডে অনেক নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত প্রতিভাবানের আবির্ভাব ঘটে। এদেরই একজন হলেন গুরচ্চাঁদ। তার প্রচারিত বক্তব্য লালনের ন্যায় বহুকাল অপ্রকাশিত থাকে ...। মহানন্দ হালদার নামের একজন গুণী ব্যক্তি গুরচ্চাঁদের মাহাত্ম কাহিণী কাব্যের মাধ্যমে গ্রন্থাগারে প্রকাশ করেন অনেক পরে। এ সব মাহাত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছিল সময়োপযোগী। নিষ্পেষিত মানুষেরা আদর্শ জীবন বিধানের নিশ্চয়তায় ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী মতুয়া মোড়কে [আদর্শে] ক্ষমতা ও ন্যায়ের সংগ্রামে উজ্জীবিত হয়।[২]

গবেষণা প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের সময় জানা যায় মতুয়া সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে সকল শ্রেণি, পেশা এবং ধর্মের মানুষের সরব উপস্থিতি থাকে। সকল মত, পথ এবং ধর্মের মানুষের সাথে তারা সহ অবস্থানে বিশ্বাসী। তাদের অবস্থান বর্ণবাদের বিরূদ্ধে। এই প্রেক্ষাপটটি বিশেষ সম্প্রদায় হিসেবে মতুয়াবাদ উত্থানের মূল কারণ। প্রসঙ্গত একজন উত্তরদাতা বলেন,

> সম্প্রদায়গত বৈষম্য যখন চরমে তখন তা নিরসন অনিবার্য হয়ে পড়ে। সে সময়ের বৈষম্যের অনিবার্য পরিণতি মতুয়া সম্প্রদায় এবং তার ক্ষমতা প্রয়োগে ন্যায় বিচার ও সাম্যের উপস্থিতি। এ সম্প্রদায়ের মদ্দি [মধ্যে] কোন বৈষম্য মূলক আচরণ করা হয়নি। যোগ্যতা থাকলে অন্য ধর্মের হয়েও সমাজে নিতা [নেতা] হওয়া যায়। বর্ণ বা গোত্রে যাই থাকুক যোগ্যতা বলে একজন ছোট জাতও [নিম্ন শ্রেণী] গুরুপদে যাতি [যেতে] পারে। ... মুসলমানের বা হিন্দুর ঘর থেকে আসলিও [আসলেও] ম্যানি [মেনে] নেয়া হয়। ন্যায়ের প্রশ্ন একানে [এখানে] মেন [মূল]। জাত বিচার একানে [এখানে] উপেক্ষিত।[৩]

৬.২ গবেষণা প্রশ্ন-২

কোন অর্থে মতুয়া সম্প্রদায়কে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচনা করা যায়? লোকধর্ম বা উপ-ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে কি অর্থে মতুয়া সম্প্রদায় অন্যান্য লোকধর্মের সাথে সম্পর্কিত?

গবেষণা প্রশ্নের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য এই প্রশ্নটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরণের প্রশ্নোত্তরে উচ্চবর্গ আরোপিত বৈষম্যের বিষয়টি সামনে আসলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎপত্তির প্রেক্ষাপট নিয়েও আলোচনা হয়। সুফি, বৈষ্ণব, বাউলের সংসার বিরাগী মনোভাব এবং কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আত্মকেন্দ্রিক সংসার ভাবনা মতুয়া আন্দোলনের বিকাশের পথ প্রশস্ত করে কিনা এমন বিষয়ে একজন উত্তরদাতা বলেন,

> ব্রাহ্মণ্যবাদের কারণে যেমন বৌদ্ধরা [বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা] এসেছিল [জন্ম হয়েছিল], তেমনি এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে, সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ, লালনবাদ, বাউলবাদের মত সাম্যের চেতনা। মতুয়ারাও সে লক্ষ্যেই আত্মপ্রকাশ করে। এদের মূল লক্ষ্য ছিল বৈষম্য বিরোধী সংসার [পারিবাকি জীবন] অনুরাগী অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা। একারণে এ অঞ্চলের হাজার হাজার অধিকার বঞ্চিত মানুষ ভিন্ন মানুসিকতায় [মানসিকতায়] মতুয়া সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হয়।[৪]

প্রতিবাদী মতুয়া দর্শন এবং তৎসংশ্লিষ্ট মতুয়া সংগীত হিন্দু, মুসলমান, মগ, ফিরিঙ্গী, ওলন্দাজ, তেলি, মালি, কর্মকার, সাহা সকলকেই এ স্বতন্ত্র ধারায় প্রভাবিত করে। সুফি, বৈষ্ণব, বাউলের মত মতুয়ারাও সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গানের চর্চা করে। মূল উদ্দেশ্য মানব প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্যলাভ ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা। প্রসঙ্গত একজন উত্তরদাতার অভিমত হলোঃ

> গানের সাথে ভালোবাসার এট্টা [একটি] সম্পর্ক আছে। গানের কথায়, গানের সুরে যতডা [যতটা] স্রষ্টা ও মানুষের কাছাকাছি আসা যায় ততডা [ততটা] আর কোন ভাবে [মাধ্যমে] আসা যায় না। দেহ-মনের সব কথা গানে আছে; মনের সাথে যার

> সংযোগ ঘটে এবং সৃষ্টিকর্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রেম। স্রষ্টার অদৃশ্য চরণ [শক্তি] স্পৃশ্য করা সহজ যায়। পাওয়া যায় মানুষের ভালোবসা। মানুষকে সহজে সংসারে [গার্হস্থ্য ধর্মে] বাঁধা যায়। জাত বিচারের বদলে [পরিবর্তে] প্রেম বাণী মূল হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[৫]

কাঠামোবদ্ধ জাত বর্ণ ব্যবস্থা আচরিত ধর্মীয় ধারা থেকে নমঃশূদ্র সমাজ মতুয়া দর্শনের মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। তারা বর্জন করতে চেয়েছে সমাজে বিদ্যমান ঐতিহ্যবাহী কুসংস্কারবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারা। এ কারণে উচ্চবর্গ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে প্রবেশের জন্য তারা আন্দোলন করেনি। তারা চেষ্টা করেছে মানব প্রেমের মাধ্যমে স্বতন্ত্র আর্থ-সামাজিক জীবন ব্যবস্থা সচল করতে। তাদের প্রবর্তিত পথে সকল শ্রেণির মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল উন্মুক্ত। এই বিষয়ে একজন উত্তরদাতা জানান,

> ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কুণ্ডু, পাল, ঝালো, মালো, নমঃশূদ্র, সাহা, সাধু এ মতে এক সাথে হয়, এক সাথে খায়, এক সাথে গায় [প্রার্থনা করে]। চারজাতি, ৩৬ বর্ণ ৬৭৪৩ শ্রেণি এখানে এক হয়ে যায়। হিন্দু মুসলমান সবাই সমান অধিকার পায়। ভালোবাসার সম্পর্ক আছে; তাই মতুয়া ধর্ম সাম্যের ধর্ম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। ইহ জগতের সুখ শান্তি গুরত্বপূর্ণ মনে করায় এদেরকে বস্তুবাদীও বলা হয়। সমাজে পরিচিতি পায় ভিন্ন [স্বতন্ত্র] ধারায়।[৬]

৬.৩ গবেষণা প্রশ্ন-৩

সামাজিক সমতা, সামাজিক ন্যায় বিচার, মানবতার বাণী প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে মতুয়া সম্প্রদায়ের সাথে সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ, বাউলতত্ত এবং কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান মিল ও অমিলগুলো কি কি?

কর্তাভজা সম্প্রদায় গার্হস্থ্য ধর্মকে গুরুত্বের চোখে দেখলেও তাদের রক্ষণশীল গুরুবাদী চেতনা এই সম্প্রদায়কে বিকশিত হওয়ার পথ সংকীর্ণ করে দেয়। অন্যদিকে বৈষ্ণব, বাউল এবং সুফিবাদী চেতনা গার্হস্থ্য ধর্মকে অগ্রাধিকার দেয়ার পরিবর্তে ফকির, সন্যাসী, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী হয়ে সংসার বিরাগী হতে উৎসাহিত করে। এই ক্ষেত্রে মতুয়ারা বিশ্বাস করে সাম্য, মৈত্রী, ন্যায় বিচার এবং সৃষ্টির ধারা অব্যহত রাখতে গার্হস্থ্য চেতনাই মুখ্য। এর ফলে নিম্নবর্গের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন জাগ্রত হয়। প্রসঙ্গত একজন উত্তরদাতার মত হলো-

> মতুয়ারা অন্ন হীনকে অন্ন দিবে নইলে তাদের গার্হস্থ্য জীবন রক্ষা পাবেনা। পর নারীকে মাতৃ জ্ঞানে গ্রহণ এবং এক বিবাহ ভিত্তিক পরিবার তাদের কাছে গার্হস্থ্য ধর্মের মূল ভিত্তি। তারা গৃহে থেকেও সন্যাসীর [নিষ্কামী] ন্যায় সরল-সোজা জীবন যাপন করে। আদর্শ বংশ ধর তৈরীও তাদের লক্ষ্য।... সুফি, বৈষ্ণব, বাউলেরা সংসার জীবনে থাকে নিরাসক্ত [উদাসীন]। কিন্তু মতুয়ারা সংসার ধর্মকে গুরুত্বের চোখে দেখে। ...শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মে অগ্রাধিকার থাকে জীবন জীবিকায়।[৭]

সামাজিক সমতা, ন্যায় বিচার, মানবতাবাদ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা সব সমাজে প্রত্যাশিত। মতুয়া সমাজ মনে করে জাত বিচার না করা, সার্বজনীন বিবাহ ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং সংসার জীবনে সকল শ্রেণির প্রতি উদারতা প্রদর্শন অপরিহার্য্য। এ সম্পর্কে একজন উত্তরদাতার অভিমত হলো,

> ...জাত বিচার থেকে বের হয়ে আসতি [আসতে] মতুয়া সম্প্রদায় আত্ম প্রকাশ করে। তথাকথিত উচ্চবর্গীয় জাতের বিচারে আমরা যারা এ সম্প্রদায়ের লোক তারা এক সময় অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ...জাতির বিচারের কারণে কারও বাড়িতি [বাড়িতে] কেউ খাওয়া-দাওয়া চলাফেরা করতে পারত না। হিন্দু সম্প্রদায়ের কারও সাথে ছেলি [ছেলে] মাইয়ে [মেয়ে] বিয়ে দিতি [দিতে] পারত না। ছোট জাত বোলি [বলে] ঘেন্না [ঘৃণা] করত। হাট বাজার এবং মন্দিরে যাওয়া যেত না। হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ধর্ম [উপ-সম্প্রদায়] সৃষ্টি করলি [করলে] জাতিবর্ণ ব্যবস্থা থেকে আমাগের [আমাদের] মত বঞ্চিত মানুষীরা [মানুষেরা] বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়...[৮]

বহু দেবতায় অবিশ্বাস, স্বতন্ত্র মন্দির স্থাপন, হরিচাঁদ ভিন্ন অন্য কাউকে না মানা এবং মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ মতুয়া দর্শনের মৌলিক দিক। বেশির ভাগ লোকধর্মে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ উৎসাহিত করা হলেও মতুয়া ধর্মে তা নিষিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে একজন উত্তরদাতা বলেন,

> ...মতুয়ারা মন্যুষত্বে বিশ্বাস করে। দেবদেবী আর প্রতিকী উপাসনা তারা পছন্দ করে না। তারা উপাসনার জন্য তৈরী [প্রস্তুত] করে নিজস্ব মন্দির। নাম দেয় হরি মন্দির। বাউল বা অন্য লোক সম্প্রদায়ের সাথে তাদের মৌলিক পার্থক্য হলো আচার-আচরণে। এক্ষেত্রে তাদের মদ্দি [মধ্যে] অঢেল তফাৎ রয়েছে। ...ওরা [বাউল] মদ, গাঁজা খায়, ওরা ভেকধারী [ছদ্মবেশী]। আমরা ওসব নিশা [নেশা] পচন্দ [পছন্দ] করিনা। ওরা [বাউল] গুরুকে ভাবে [চিন্তা করছে] মাধ্যম, আমরা ভাবি [চিন্তা করি] স্বয়ং স্রষ্টা।...মানব সেবার ব্রত নিয়ে মানুষকে সেবা যত্ন করি.... মানব সিবার [সেবার] মাধ্যমেই উনাকে [তাঁকে] পাওয়া যায়।[৯]

৬.৪ গবেষণা প্রশ্ন-৪

প্রাত্যহিক জীবনে মতুয়া সম্প্রদায় কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে? সামাজ সংস্কারের ধারায় তাদের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী?

এই শেষ গবেষণা প্রশ্নটির জবাবে জানা যায় মতুয়া সম্প্রদায় বাংলাদেশের সমাজকাঠামোয় নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। শিক্ষা, অর্থ, স্বাস্থ্য, চাকুরী, আধ্যাত্মিকতা, সামাজিক সংহতি এবং সমাজ সংস্কারসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মতুয়াবাদের প্রভাব আছে বাঙালি চরিত্রে। যোগ্যতার মানদণ্ড প্রসঙ্গে একজন উত্তরদাতা বলেন,

> সনাতনী কুসংস্কার থেকে আমরা বেরিয়ে আসতি [আসতে] পেরেছি। আমরা বাবা মায়ের শ্রাদ্ধে, ছেলে মেয়ের বিয়ে বা অন্ন প্রাসনে বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ নিই [নেই] না। আমাদের মদ্দি [মধ্যে] যারা যোগ্যতা অর্জন করেছে তারাই এ কাজ গুলো করে। পরকালের মঙ্গল ইকানে [এখানে] মুখ্য নয়। আমরা মনে করি জ্ঞান, কর্ম এবং শিক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করলি [করলে] ছোট জাতির [জাতের] প্রসঙ্গটা অবান্তর হয়ে যায়। অবহেলিতরা ফিরে পায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার।[১০]

মতুয়া সম্প্রদায়ের সমাজ সংস্কারের সর্বাপেক্ষা বড় দিক হল বর্ণবাদী ধারা থেকে বেরিয়ে এসে ধর্ম পালনে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সৃষ্টি করা। উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাদের জাতিবর্ণ প্রথা বিরোধী কর্মকাণ্ডের অনেক কিছু এখনও অপ্রকাশিত। তাব তাদের কথায় প্রকাশ মানুষসহ সৃষ্টির সমস্তই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মর্যাদা পায়। সকল মানুষ তাদের কাছে এক ও অভিন্ন অধিকার পাওয়ার যোগ্য। শাস্ত্রীয় ধর্মের বাড়াবাড়ি তারা মেনে নেয়নি। এই প্রসঙ্গে একজন উত্তরদাতার জানান,

> আচার সর্বস্ব ধর্মে মতুয়ারা বিশ্বাস করে না। জাত বিচারের উদ্দে [উর্ধ্বে] উঠে আসি [এসে] সব মানুষকে সমান মনে করে। তারা মনে করে সর্ব ধর্ম অপেক্ষা মানব ধর্ম আসল। জীবের প্রতি দয়াশীল হওয়া মানুষের প্রতি নিষ্ঠাবান [দায়িত্বশীল ও কর্তব্য পরায়ন] থাকা ছাড়া আর সব কিছু মূল্যহীন। মৃত দেহের সৎকারে পুড়ানো বা মাটি দেওয়ায় তাদের আপত্তি নেই। ... মাটির প্রতিমা নয়, তারা পূজা করে জীবন্ত মানুষের। তীর্থে ঘুরে লাভ নেই, ভালবাসতে হবে নিজ ঘর সংসার। শ্রাদ্ধ নয় শ্রদ্ধানুষ্ঠানে তারা বিশ্বাসী।[১১]

সর্বজনীন ক্ষমতায়নে পরমত সহিষ্ণুতার সামাজিকীকরণে মতুয়া সমাজ নিবেদিত প্রাণ। তবে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের কুট চালে অটকা পড়ে অন্ত্যজ শ্রেণির অনেক মানুষ। ফলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনটি পর্যন্ত চলে যায় ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের আওতায়। একজন উত্তরদাতার উত্তররাধিকার বিষযক জবাবটি এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য। এটি হলোঃ

> ...যেহেতু মতুয়া সম্প্রদায় সব ধর্ম থেকে আলাদা সেহেতু এখানে উত্তরাধিকার আইনে রয়েছে স্বতন্ত্র ধারা। কারণ মতুয়ারা বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

> তাদের মূল বিষয় নিপীড়িত মানুষকে যন্ত্রণা মুক্ত করা ...তবে বর্তমানে মতুয়া সম্প্রদায়ের লোকজন হিন্দু আইনে উত্তরাধিকার গ্রহণে বাধ্য হয়। উদারতা দিয়ে ছেলে মেয়েতে সম্পত্তি বন্টনে মতুয়া ধর্মে কোনো আপত্তি তোলা হয় না। এটি মতুয়া ধর্মের প্রচারক গুরচ্চাঁদ ঠাকুরের সুস্পষ্ট নির্দেশনা। আর মতুয়া প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর পুত্র কন্যাদের মাঝে সম্পত্তির সমান বন্টন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।[১২]

একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের তথাকথিত ধর্মাচার অন্যদিকে জল জঙ্গলের দেশ বাংলা অঞ্চলে তখন ম্যালেরিয়াসহ অনেক রোগের ছিল ব্যাপক প্রকোপ। কখনও কখনও তা ছিল মহামারী আকারের। তাই আধুনিক চিকিৎসা বঞ্চিত মতুয়া সম্প্রদায়ের জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর ভেষজ চিকিৎসা এবং তান্ত্রিক চিকিৎসার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। সমাজের বাস্তবতায় যাই করা হোক না কেন এখানে পশ্চাদপদতার ছাপ স্পষ্ট। একজন উত্তরদাতার উত্তরে এর সত্যতা মেলে। তিনি বলেন-

> মতুয়া গুরচ হরিচাঁদ ঠাকুর বলন, যে রোগ যাতে বাড়ে [বৃদ্ধি] রচগীকে [রোগীকে] তাই খাতি [খেতে] দিতে হয়। কঠিন ব্যাধিতে পর পর তিন সন্ধ্যা ধুলি [ধুলা] মাখার পরামর্শ যেমন আছে তেমনি আছে তুলসীর পাতা ব্যবহারের কথা। তিনি জ্বর, পেট ব্যথা, অজীর্ণ, বমি কিম্বা অম্ল পিত্তে পিতলের পাত্রে তেতুল গুলে খাতি [খেতে] বলতেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে গোবর এবং গো মূত্র ব্যবহারের পরামর্শও আছে তার।[১৩]

উল্লিখিত তথ্যের আলোকে বোঝা যায় গবেষণায় উঠে এসেছে এথনোগ্রাফিক চিত্র। গবেষণা প্রশ্নের সাহায্যে এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের অনেক অজানা বিষয় সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়। এই সময় মৌখিক বক্তব্যের সাথে বাস্তব কার্যক্রমের বৈধতা ও নির্ভরযোগ্যতা বোঝা যায় ভালোভাবে। তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি ভালো নকশা পাওয়া যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে তথ্য বিশ্লেষণের আলোকে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করা হবে।

তথ্যপঞ্জি

১। শুভ্রনাথ মন্ডল, পিতা- কালিদাস মন্ডল, গ্রাম- কাশিয়াডাঙ্গা, ডাকঘর- খলিশখালী, উপজেলা- তালা, জেলা- সাতক্ষীরা, পেশা- সার্ভেয়ার, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ২৫ অক্টোবর, ২০১৬খ্রি. (উত্তরদাতা-৫)

২। বিষ্ণুপদ বাগচি, পিতা- অজিত কুমার বাগচি, গ্রাম- বাঁশতলী, ডাকঘর- বাঁশতলী, উপজেলা- রামপাল, জেলা- বাগেরহাট, পেশা- হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ চিকিৎসালয়, তারিখ- ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬খ্রি.। (উত্তরদাতা-১৫)

৩। বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, পিতা- মৃত. নিরঞ্জন বিশ্বাস, ৯ নং জলিল স্মরণি, ছোট বয়রা, খুলনা, পেশা- কৃষি কর্মকর্তা, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ৫ জানুয়ারি, ২০১৭খ্রি.। (উত্তরদাতা-১৯)

৪। পবিত্র সরকার, পিতা- মৃত. রচইতন সরকার, গ্রাম- তাহেরপুর, ডাকঘর- চন্ডিপুর, উপজেলা- মণিরামপুর, জেলা- যশোর, পেশা- সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ১১ নভেম্বর, ২০১৬খ্রি.। (উত্তরদাতা-৮)

৫। অপর্ণা গাইন (সাবেক মহিলা ইউপি সদস্য), পিতা- মোহন গাইন, গ্রাম- মির্জাপুর, ডাকঘর- মির্জাপুর, উপজেলা- ডুমুরিয়া, জেলা- খুলনা, পেশা- গৃহিণী, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ২৬ নভেম্বর, ২০১৬খ্রি.। (উত্তরদাতা-১০)

৬। সন্দীপন মন্ডল, পিতা- অনিন্দ মণ্ডল, গ্রাম- রংপুর, ডাকঘর- রংপুর, উপজেলা- ডুমুরিয়া, জেলা- খুলনা, পেশা- গবেষণা, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ কার্যালয়, তারিখ- ১০ জানুয়ারি, ২০১৭খ্রি.। (উত্তরদাতা-২০)

৭। মণিশান্ত মন্ডল, অধ্যক্ষ, মশিয়াহাটী ডিগ্রি কলেজ, মনিরামপুর, যশোর। সাক্ষাৎকারের স্থান : অধ্যক্ষের কার্যালয়, তারিখ : ১৩ অক্টোবর, ২০১৬খ্রি.। (উত্তরদাতা-২)

৮। অনিন্দ সুন্দর মন্ডল, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ডুমুরিয়া মহাবিদ্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা। সাক্ষাৎকারের স্থান : নিজ বাড়ি, তারিখ : ১৭ অক্টোবর, ২০১৬খ্রি.। (উত্তরদাতা-৩)

৯। প্রফুল্ল কুমার রায়, পিতা- প্রবোধ চন্দ্র রায়, গ্রাম- কৈয়াবাজার, ডাকঘর- কৈয়াবাজার, উপজেলা- বটিয়াঘাটা, জেলা- খুলনা, পেশা- কৃষি, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ৪ ডিসেম্বর, ২০১৬খ্রি.। (উত্তরদাতা-১২)

১০। ডাঃ সুধাংশু শেখর মালাকার, পিতা- মৃত. শরৎ চন্দ্র মালাকার, গ্রাম- কালিনগর, ডাকঘর- তেরখাদা, উপজেলা- তেরখাদা, জেলা- খুলনা, পেশা- চিকিৎসক, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ চেম্বার, তারিখ- ৫ নভেম্বর, ২০১৬খ্রি.। (উত্তরদাতা-৫)

১১। পরশ বিশ্বাস, পিতা-জয়ন্ত বিশ্বাস, গ্রাম- কুলুটিয়া, ডাকঘর- মশিয়াহাটী, উপজেলা- মনিরামপুর, জেলা- যশোর, পেশা- মুক্তিযোদ্ধা, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ১৮ নভেম্বর, ২০১৬খ্রি.। (উত্তরদাতা-৯)

১২। শ্রীমতি মালতি মন্ডল, স্বামী- মৃত. শান্তিরঞ্জন মন্ডল, গ্রাম- পাঙ্গাশিয়া, ডাকঘর- পাঙ্গাশিয়া, উপজেলা- চিতলমারী, জেলা- বাগেরহাট, পেশা- গৃহিণী, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ২১ অক্টোবর, ২০১৬খ্রি. (উত্তরদাতা-৪)

১৩। অসীত বরণ মন্ডল, পিতা- নিমাই মণ্ডল, গ্রাম- দেবীতলা, ডাকঘর- দেবীতলা, উপজেলা- বটিয়াঘাটা, জেলা- খুলনা, পেশা- শিক্ষকতা, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ৩১ অক্টোবর, ২০১৬খ্রি.। (উত্তরদাতা-৬)

সপ্তম অধ্যায়

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করেছি। এই সময় গবেষণা প্রশ্নের বাইরে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষন যেমন ছিল তেমনি ছিল অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্ট প্রভাব। বর্তমান আধ্যায়ে গবেষণা তথ্যের আলোকে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করব।

- জমিদার নীলকরদের নির্যাতন, খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রচারকদের আগ্রাসন এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী নিপীড়নের চরম পর্যায়ে মতুয়া সম্প্রদায় উৎপত্তি ও বিকশিত হয়। এছাড়া ইংরেজ শাসনের প্রভাবে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ মানুষের গুরচত্ব যায় বেড়ে। বাংলা ভূখণ্ডে সে সময় নমঃশূদ্র সম্প্রদায় সংখ্যাধিক্য থাকায় ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী মতুয়া সম্প্রদায়ের বিকাশের পথ সহজ হয়। সুফি, বৈষ্ণব, বাউলের খাদ্যাভ্যাস, অসাম্প্রাদয়িক চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতির সমান্তরালে সমাজে তৈরী হয় এ ধারা।
- সাম্যবাদ, ন্যায় বিচার এবং আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রেরণা সৃষ্টিকারী মতুয়া সংগীত অন্ত্যজসহ সকল মানবতাকামী মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগায়। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার এই দুঃসময়ে মতুয়া সাহিত্য-কর্ম, সংগীত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী ধর্মীয় ধারা সমাজ পুনর্গঠনে বশেষ ভূমিকা রাখে। অশ্বিনী সরকার, তারক সরকার, বিজয় সরকার, মহানন্দ হালদারের মত প্রতিভাবানেরা চলে আসে মতুয়া আন্দোনের পতাকাতলে। জমিদার, মহাজন এবং উচ্চবর্গ আরোপিত বৈষম্য বিরোধী সংগীত রচনা ও হরি-গুরচচাদের কথামৃত প্রচারে অংশগ্রহণ করেন প্রবল প্রতাপে।
- গবেষণায় সুফি, বৈষ্ণব এবং বাউলের সাথে মতুয়াদের মিল এবং অমিল উভয়ই রয়েছে। গুরুবাদ সবার মধ্যে আছে, পার্থক্য কেবল প্রয়োগে। ত্রচটিপূর্ণ সামাজিকীকরণের কারণে শাস্ত্রীয় শাসন, সামাজিক প্রথা, লোকাচার ও লোকবিশ্বাস থেকে কোন লোকধর্মই পুরোপরি বেরিয়ে আসতে পারেনি। অন্ন পাপ, জাতি বর্ণ প্রথা, স্বজনপ্রীতি এবং উপ দলীয় কোন্দল এদের মধ্যেও আছে। নমঃশূদ্রসহ সকল নিম্নবর্গীয় মানুষের মাঝে এটি শুরচ হয় তৎকালীন ফরিদপুরের ওড়াকান্দি গ্রাম থেকে। পদ্মাপারের ফরিদপুর এবং খুলনা অঞ্চলে এখনও রয়েছে এদের ব্যাপক প্রভাব ।
- বর্ণবাদ বিরোধী আদর্শ সমাজের প্রত্যাশায় মতুয়া সম্প্রদায়ে মদ, গাঁজাসহ সকল প্রকার নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে থাকে। এ সম্প্রদায়ে, তেলি, মালি, কামার, কুমার, সাহা, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণসহ সকল শ্রেণির মুক্তিকামী লোকজন দীক্ষিত হয়েছে। গায়ে হলুদ, নবান্ন উৎসব, বাংলা নববর্ষ, জারি, সারি, যাত্রা, ঈদ এবং পূজাসহ সকল প্রকার বাঙালি সংস্কৃতির সাথে তারা একাত্ম হয়ে চলে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে এই ভূ-খণ্ডের নমঃশূদ্র-মুসলমান এক অবস্থানে থাকে। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ছিলেন তাদের নেতা। মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশী আন্দোলন প্রত্যাখান করে নিজ জাতির মধ্যকার বৈষম্য নিরসনের অহবান করা হয় মতুয়া আন্দোলনে।

- বিশুদ্ধ প্রেম, বেদ বিরোধী মনোভাব এবং বাংলা ভাষায় ধর্ম প্রচার মতুয়াবাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অনুন্নত জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়রা। বৃটেনে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বছরে (১৮৮২) মতুয়া সম্প্রদায়ের সাংগঠনিক নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজ ঘরের বারান্দায় পাঠশালা স্থাপন করেন। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, কৃষি সকল ক্ষেত্রে রয়েছে তাদের অংশীদারীত্ব। মানুষকে অর্থ, শিক্ষা এবং শ্রদ্ধার সম্পদ হওয়ার প্রেরণা যোগায় মতুয়া আন্দোলন। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পথ পরিক্রমায় মতুয়া সম্প্রদায় ইতিহাসের ভিতরে আরেক ইতিহাস। এটি কোন রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, এটি হল নমঃজাতির অধিকার ফিরে পাওয়ার ইতিহাস।
- সুফিবাদের ন্যায়পরায়নতা, মানবতাবাদ, বৈষ্ণববাদের সাম্য, মৈত্রী, নৈতিকতা এবং বাউলের দেহতত্ত্বের প্রভাব পাওয়া যায় মতুয়া সম্প্রদায়ের আদর্শিক ভাবনায়। তবে মানুষের মাঝের ষড়রিপু, ব্রাহ্মণ্যবাদের দীর্ঘ সামাজিকীকরণ এবং বিদ্যমান আমিত্ববোধ এখানে প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দেয়। সুফি বৈষ্ণব, বাউল এবং কর্তাভজায় স্রষ্টার নৈকট্যলাভের মাধ্যম হলেন গুরু। মতুয়া সম্প্রদায়ে শ্রী চৈতন্য, গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর অনু অবতার হরিচাঁদ ঠাকুর ইহ জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে গণ্য। আর হরিচাঁদ পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর হলেন এ সম্প্রদায়ের সাংগঠনিক নেতা। ব্রাহ্মণ সমাজের উপেক্ষিত নাম 'মতো' 'মতো' গালি আজকের মতুয়া সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক নমঃশূদ্রকূলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অধিকার বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ মানুষের অধিকার আদায়ে কাজ করেন। গৌতমবুদ্ধের নির্বাণ লাভের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন গার্হস্থ্য ধর্ম। যোগ্যতা অর্জন করলে নীচু বংশে জন্ম হলেও মূল্যায়নের কৃপণতা রাখা হয়না মতুয়া মতবাদে।
- লোকসমাজের মাঝে জন্ম নেয়া মতুয়া সম্প্রদায় লোকচিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে শিক্ষিত মতুয়াদের মাঝে এ প্রবণতা কমে আসলেও স্বল্প শিক্ষিত এবং নিরক্ষর লোকজনের মধ্যে এ প্রবণতা পূর্ববৎ। সূচনালগ্নে মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বেশিরভাগ মানুষ ছিল অন্ত্যজ শ্রেণিভূক্ত। তাই চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত উচ্চ শ্রেণিভুক্ত চিকিৎসকেরা বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অন্ত্যজ শ্রেণিকে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত করে। প্রকারন্তরে করে নানাভাবে হয়রানি। তাই রোগ মুক্তির প্রত্যাশায় তাদের মাঝে তান্ত্রিক চিকিৎসার পাশাপাশি ভেষজ চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় বেশি মাত্রায়। এটি হরি-গুরুচাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।
- আচার সর্বস্ব ধর্মে মতুয়ারা বিশ্বাস করে না। এই কারণে বিবাহিত মহিলাদের শাখা সিঁদুর ব্যবহার করা বা না করা নিয়ে মতুয়া মতবাদে মাথা ব্যথা নেই। এই মতে দীক্ষার প্রয়াজন হয়না। তিলক কাটা, মালা পরা, তীর্থ পর্যটন অথবা পৈতার দরকার পড়ে না মতুয়া গুরুবাদে। তারা মনে করে যে যারে ভক্তি করবে সেই তার গুরু, সেই তার ঈশ্বর। তাদের দৃষ্টিতে মন হল মন্দির, মন হল মসজিদ, মন হল প্যাগোডা। বিবাহের ক্ষেত্রে বর্ণ বা গোত্র তাদের কাছে গুরুত্বহীন। বাল্য বিবাহ, সতীদাহ প্রথা এবং বিধবা বিবাহ মতুয়া সম্প্রদায়ে নিষিদ্ধ। রাষ্ট্রীয় আইন যাই থাক পুত্র কন্যাদের মাঝে সম্পত্তি বন্টনে তারা সমতার নীতিতে বিশ্বাসী। সাম্যবাদী চেতনা তাদের মৌলিক দর্শন যার মূল ভিত্তি বস্তুবাদ আর মানব প্রেম।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা থাকলেও মতুয়া সম্প্রদায় সকল প্রকার অনাচার বিরোধী একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন। বাংলার লোকধর্ম বিকাশের পথে এটি ইতিহাসের অভ্যন্তরে আরেক করচ্য ইতিহাস। এই সম্প্রদায়টি লোকধর্মে বিদ্যমান অন্যান্য উপাদান দ্বারা কম বেশি প্রভাবিত। উণবিংশ শতাব্দীতে (১৮১২-১৮৭৮) নমঃশূদ্র কূলে মাহাত্মা হরিচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়া দর্শনের আত্মপ্রকাশ। তাত্ত্বিকভাবে হাতে কাজ মুখে নাম মূল মন্ত্র এবং প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম পালনে সম্প্রদায়ভুক্তদের উৎসাহিত করা হয়। শ্রী চৈতন্য, গৌতম বুদ্ধ, আউল চাঁদসহ লোকধর্ম প্রবক্তাদের অনুকরণে মনবতাবাদের বীজ রোপন করেন সমাজে। এ মতবাদের তাত্ত্বিক প্রবক্তা হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) এবং সাংগঠনিক ও প্রায়োগিক নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭)। একটি নিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী চেতনার ধারক ও বাহক মতুয়া আন্দোলন। পরিশেষে বলা যায় মতুয়া সমাজ সুফি-বাউল-বৈষ্ণব অথবা কর্তাভজা আদর্শ মিশ্রিত মানব প্রেমিক এক বিপ্লবী সম্প্রদায়। পরবর্তী অধ্যায়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক মুল্যায়ণ এবং পরবর্তী গবেষণায় দিক নির্দেশনা মূলক একটি উপসংহার প্রণয়ন করা হবে।

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার বলা যায় যে, বাঙালির ধর্মীয় জীবন সাধারণত রাষ্ট্রীয়ভাবে চারটি ধর্মকে স্বীকৃতি দেয়। যথা- মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান। এই চারটি ধর্ম ছাড়াও বাংলাদেশে আরো অনেক লোকধর্মীয় সম্প্রদায় রয়েছে। এই গুলো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃত এই চারটি ধর্মের অভ্যন্তরে নীরবে নিভৃতে চর্চিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে কোনোটির অনুসারীদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। অবশ্য রাষ্ট্রিয় পরিসংখ্যান থেকে এটি জানা যায় না। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ মূলক গবেষণায় তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এমন ধারণা হযেছে। এদের ধর্মাচার, উৎসব, মেলা প্রভৃতি পলনের ক্ষেত্রও বেশ সরব। কিন্তু তাদের ধর্মানুসারী হিসেবে আলাদা কোনো স্বীকৃতি নেই। প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মধ্যে আরো যে সব ধর্মীয় চর্চিত হয়ে আসছে তাদের স্বতন্ত্রভাবে পরিচয়ের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। যদিও এই গুলোতে রয়েছে আশ্রম, আখড়া, খানকা, মাজার, মঠ, মন্দির ইত্যাদি নামক প্রাতিষ্ঠান। কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠান থাকার পরও তারা উপরিউক্ত চারটি ধর্মীয় পরিচয়ে পরিচিত। এমনি প্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দোহাই দিয়ে এই ধর্মগুলোকে 'লোকধর্ম; এবং অনুসারীদের 'লোক ধর্মানুসারী; বলে অভিহিত করা হয়। যদিও অনেকগুলো ধর্মের অনুসারীগণ লোকধর্ম প্রত্যয় দ্বারা তাদের ধর্মকে চিহ্নিত করাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ সব ধর্মকে বিশ্লেষণ করার জন্য গবেষণা এবং গবেষকের এছাড়া উপায় থাকে না।

লোকধর্ম হিসেবে যে সব ধর্মকে চিহ্নিত করা হয় সেগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এরা স্বীকৃত কোনো শাস্ত্রীয় গ্রন্থ মানে না। মানলেও সেগুলোর রীতি-নীতি যথেষ্ঠ শিথিল। কখনো কখনো এগুলো প্রতিষ্ঠিত ধর্মের শাস্ত্রকে একেবারে অস্বীকার করতে পারে না। কিংবা এই সব প্রতিষ্ঠিত ধর্মের শাস্ত্রকে মেনে নিয়েই তাদের ধর্মাচার, রীতি-নীতি পালন করতে হয়। এর মধ্যে সর্বজনীন আবাহন থাকে। কোনো না কোনোভাবে সেগুলো প্রতিষ্ঠিত ধর্মের রীতির প্রতি বিদ্রোহী ভাব পোষণ করে কিংবা তার সমান্তরালে চর্চিত হয়। এরা শাস্ত্রীয় ধর্মের পালনীয় রীতিকে কঠোর ভাবে পালন করতে চায় না। এমন সব বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে বলেই বর্তমান অভিসন্দর্ভে আলোচিত সম্প্রদায়গুলোকে যথাস্থানে লোকধর্ম নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ধর্মগুলো সম্পর্কে আলোচনা করাতে গিয়ে দেখা যায় এর অনুসারীগণ প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলো দ্বারা নানাভাবে নিষ্পেষণের স্বীকার। কখনো বা এই সব প্রতিষ্ঠিত ধর্মের অনুসারীদের সাথে তাদের তত্ত্বগত ও প্রায়োগিকতর্কে নামতে হয়েছে কিংবা আত্মরক্ষার্থে নির্জনবাসী হয়ে জীবন যাপন করতে হয়েছে, কখনো হতে হয়েছে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ অথবা উচ্চ বর্গ কর্তৃক লাঞ্চিত। এই লক্ষণ যেমন অতীত সমাজে ছিল তেমনি বর্তমানেও। বর্তমান গবেষণা পরিচালিত করতে গিয়ে লক্ষ করা যায় লোকধর্মের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান কখনো শাস্ত্রীয় ধর্মের অনুসারীগণ দ্বারা দখল করে রাখার নজির বর্তমান। আবার কখনো বা লোকধর্মের প্রবর্তক বা প্রচারকদের নিজেদের ধর্মের মাহাত্ম বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা লক্ষণীয়। ফলে লোকধর্ম অনুসারীদের এই অবদমিত অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে গবেষণার গরচত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ধরা দিয়েছে।

বর্তমান গবেষণা পরিচালিত করতে গিয়ে দেখা যায় খুব কম সম্প্রদায় আছে যারা নিজেদের হিন্দু, মুসলামান, বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান পরিচয়ের বাইরে পরিচয় দেয়। প্রায় সকল সম্প্রদায়ই প্রতিষ্ঠিত এই সব ধর্ম দ্বারা নিজেদের পরিচয় নিরূপণে আগ্রহী। তারা নিজেদের আলাদা করে কর্তাভজা বা মতুয়া কিংবা বৈষ্ণব ভাবতে চায় বটে কিন্তু তারা কেউ হিন্দু বা

মুসলমান নয় এমন মনে করে না বা মনে করার পরিবেশ পায়না। তারা নিজেরা হিন্দু হয়েই সৎসঙ্গী বা মতুয়া। তাদের মধ্যে শাস্ত্রীয় ধর্মের শাস্ত্রকে অস্বীকার করার পরও সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের তথাকথিত এই সব বড় ধর্মের অনুসারী হওয়ার প্রবণতা মেলে। অনুসারীগণ যেমন মতুয়া হয়েও হিন্দু এবং সুফি হয়েও মুসলমান থাকতে চায় তেমনি এই সব বড় ধর্মের পরিচয় থেকে নিজেদের বিযুক্ত রাখার প্রমাণও লক্ষণীয়। যেমন বাউল তথা ফকিরী ধর্মের অনুসারীগণ। এরা নিজেদের ফকির বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এতে তারা আত্মতৃপ্তি অনুভব করে।

বর্তমান গবেষণা পরিচালনা করতে গিয়ে দেখা গেছে বাংলাদেশের মতুয়া অনুসারীরা কোনো না কোনোভাবে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। ধর্মগুলোর প্রবর্তকের জন্মস্থান বা প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট পীঠস্থান ভক্তের দানকৃত অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত। এই গুলোকে কেন্দ্র করে বিশেষ কমিটি গড়ে উঠেছে। এসব কমিটিকে আশ্রয় করে কিছু সুযোগভোগী শ্রেণি গড়ে ওঠার নজীরও কম নয়। যাদের সঙ্গে আবার সাধারণ অনুসারীদের আত্তীক সম্পর্কে ফারাক লক্ষণীয়। ‘শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ শিক্ষা ট্রাস্ট’ এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটি ভেঙ্গে এখন ‘শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ স্মৃতি ট্রাস্ট’ হয়েছে। এছাড়া সদস্যদের মাঝে পরস্পরের প্রতি অনাস্থার প্রমাণও মেলে।

বাংলাদেশের মতুয়া ধর্ম তার অনুসারীদের ভক্তির উপর নির্ভরশীল তা লক্ষণীয়। যে কোনো ভাবে তারা তাদের ধর্মাবতারকে সকলের উর্ধ্বে নিয়ে যেতে প্রস্তুত। তাদের ভাব-ভাবনায় এই বিষয়ে কোনো আপোস করার নজির পাওয়া যায় না। নিজেরা প্রবর্তককে যেমন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছে তেমনি তাঁর পরিচয় দিতে নিজেদের বয়ানে মহৎ করে উপস্থাপন করার কমতি নেই। যতোদূর পারে লৌকিক-অলৌকিক ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন করে নিজ মতবাদের প্রবর্তককে উপস্থাপন করে। ফলে নিজ ধর্মের প্রবর্তককে চিহ্নিত করতে গিয়ে ভক্তের জবানীতে অতিমাত্রিকতা লক্ষ করা যায়। এটি গবেষণা অনেক সময় কঠিন করে তুলেছে।

বাংলাদেশের লোকধর্মের প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যায় এখানকার মতুয়া দর্শন অধ্যাত্ম ভাব পরিমণ্ডলের খোরাক যোগাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর সাথে কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের সুদীর্ঘকালের অপূরণীয় আকাঙ্খা মিলে যায়। এই রকম মিলের সাথে আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার ইতিহাস জড়িত। যে কারণেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন এর মধ্যে সময়ের অসঙ্গতি থেকে পরিবর্তনের আকাঙ্খা বিদ্যমান। সামাজিক সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে দেখা যায় সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারহীনতার মধ্য দিয়ে নিজেদের শ্রেণি অবস্থান পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছে মতুয়ারা। এরা জাতি-গোষ্ঠী শ্রেণি আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধানে নিজেদের মধ্য থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে থাকে। যখন কোনো এক জন সেই আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তখন সে নিজ শ্রেণি-গোষ্ঠির কাছে মহৎপ্রাণ। এমনই মহৎ প্রাণ ব্যক্তিত্ব হলেন শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর এবং শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁরা আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠিত রীতির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং সেগুলোকে নতুন করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। নতুন এই ভাবনা দিয়েই তারা তাদের অধ্যাত্ম ও জাগতিক সংকট নিরূপণের চেষ্টা করে। শুরচ করে আর্থ-সামাজিক আন্দোলন। মন্ত্র দেয় ‘হাতে কাজ, মুখে নাম, ভক্তিই প্রবল’। এই আন্দোলন জমিদার, নীলকর, ইংরেজ এবং উচ্চবর্গ প্রণিত ধর্মাচারের বিরচদ্ধে।

মতুয়া অনুসারীগণ কতোকগুলো প্রথা, লোকাচার, লোককথা, কিংবা দ্বাদশ আজ্ঞা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। গুরচত্বারোপ করে শিক্ষা অর্জনের উপর। ফলে তাদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের কখনো বিরোধ আবার কখনো সমন্বয় গড়ে ওঠে। যখন এই সমন্বয়ধর্মীরূপ ব্যাপকতা লাভ করে তখন মতুয়া অনুসারীদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম হতে নিজেদেরকে স্বতন্ত্র ভাবতে চায় না। পক্ষান্তরে সমন্বয় রক্ষিত না হওয়ায় বা আত্মপ্রতিষ্ঠায় স্বতন্ত্র

ব্যাখ্যাকে যাপিত জীবনে আবশ্যিক হিসেবে গণ্য হওয়ায় তারা প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় হতে বাইরে অবস্থানের আগ্রহ প্রকাশ করে। কিংবা প্রতিষ্ঠিত ধর্মের অনুসারীদের এক কোনো একটি গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে নিয়ে নিজেদের আলাদা পরিমণ্ডল গড়ে তোলে।

স্বতন্ত্র চিন্তা নিয়ে গড়ে ওঠা মতুয়া ধর্মের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের অনেক প্রত্যয়গত পার্থক্য পরিরক্ষিত হয়। এই পার্থক্যগুলো যেমন সামাজিক আচার আচরণগত তেমনি অধ্যাত্মবাদী ও পারলৌকিক। যেমন মতুয়া সম্প্রদায় স্বর্গ নরককে মৃত্যু উত্তর কালের জগৎ বলে মানতে নারাজ। পাপ পূণ্যের ধারণাকে শাস্ত্রানুযায়ী তারা স্বীকার করে না। কারো মধ্যে আবার ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সামাজিক বিষয়ে নতুন চেতনা তৈরী হয়। সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্ক পারলৌকিক ধারণা গঠনের এই ভিন্ন প্রথা যে প্রাতিষ্ঠানিকতা দান করে তা রীতি মতো শাস্ত্রীয় ধর্মের আচার বিরচ্ছ। যেমন বাউলদের বিয়ে পদ্ধতি, মতুয়াদের পূজা-মৃতের শ্রাদ্ধ রীতিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরোহিত বর্জন, বৈষ্ণবের শ্রী চৈতন্য ধ্যান, কর্তাভজাদের স্বতন্ত্র গুরুবাদে বিশ্বাস অভিনবতো বটেই প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত প্রথার পাল্টা বা ভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিকতা দান করে।

যে কোনো লোকধর্মের প্রবর্তকের চিন্তন-মনন কেবল পারলৌকিক ক্রিয়া আর আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর মধ্যে থাকে কোনো না কোনো রাজনৈতিক চেতনাও। ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য থেকে হারানো ঐতিহ্যকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা কিংবা আত্মপ্রতিষ্ঠায় নতুন ইতিহাস গড়ে তোলার প্রয়াস থাকে। ফলে এই সব আন্দোলনকে নিছক ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সংযোগ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রায়োগিক নেতা গুরচাঁদ ঠাকুর তাই বলেছেন, 'যার দল নেই, তার বল নেই'। তাই ধর্মীয় নেতাকেও রাজনৈতিক চেতনার মধ্য দিয়ে আচার পালনে উৎসাহিত হতে দেখা যায়। কখনো আবার ব্যক্তির এই সব কর্ম প্রয়াস সামগ্রীক শ্রেণি চৈতন্যকে জাগিয়ে দেয়। এই কারণে হরিচাঁদ, আউলচাঁদ, লালনকে সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চৈতন্য জাগ্রত করতে দেখা যায়। তারা পরবর্তীতে স্রষ্টা বনে যায় তেমনি নতুন ইশ্বর প্রতিষ্ঠা করে। একইভাবে, মনোমোহন, রামঠাকুর, অনুকূল চন্দ্র, ভবাপাগলা, রামদুলাল, বলরাম হাড়ি, রামশরণ পাল, কুবের, টিপু, বৃহস্পতি প্রমুখ আধ্যাত্মিক নেতা হয়ে ওঠে। এই সব আধ্যাত্মিক নেতারাই সামাজিক সংকট মোকাবেলার মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়। যে সম্প্রদায়গুলো কখনো প্রবর্তকের জীবিতকালে কখনো বা তার উত্তর কালে জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। তবে সকল ক্ষেত্রেই এক এক জন অনুসারীর কর্মময় জীবনকে আশ্রয় করে এই সব লোকধর্মগুলো টিকে থাকে। বহমান থাকে লৌকিক চেতনার সামাজিক আন্দোলন। সামগ্রীকভাবে বলা যায় মতুয়া আন্দোলন বাংলার লোকসমাজে লোকধর্মের চেতনায় সমুজ্জ্বল এক শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন। পরবর্তী উৎসাহী গবেষকের কাছ থেকে হয়তো আরও নতুন কোনো তাত্ত্বিক জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যাবে এমন আশাও ব্যক্ত করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. অক্ষয় কুমার দত্ত, fviZel©xq DcvmK m¤cÖ`vq (c_g LÐ) কলকাতা, করচ্চা প্রকাশনী, ১৯৮৯।

২. অক্ষয় কুমার দত্ত, fviZel©xq DcvmK m¤cÖ`vq (wØZxq LÐ), কলকাতা, করচ্চা প্রকাশনী, ১৯৯৯।

৩. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, evsjv mvwn‡Z¨ m¤úY© BwZeË, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০।

৪. অশ্বিনী কুমার সরকার, kx kx nwi m½xZ, গোপালগঞ্জ, ওড়াকান্দি, ১৯৯১।

৫. অতীন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), Phvc`, কলকাতা, নয়া প্রকাশ, ১৯৯৯।

৬. অনুপম হীরা মণ্ডল, evsjvi fvev‡›`vjb I gZqv ag, ঢাকা, গতিধারা, ২০০৭।

৭. অলোক মৈত্র, evsjvi †jŠwKK agPv‡ii HwZn¨ mÜv‡b, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০০।

৮. অতুল সুর, fvi‡Z weev‡ni BwZnvm, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫।

৯. অঞ্জলি বসু (সম্পাদিত), msm` evsjv PwiZvwfavb, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬।

১০. আহমদ শরীফ, evOvjx I evsjv mvwnZ¨, ঢাকা, নিউএজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯।

১১. আহমদ শরীফ, evDj ZË, ঢাকা, পড়ুয়া, ২০০৩।

১২. আহমদ শরীফ, cZ¨q I cZ¨vkv, ঢাকা, স্বকাল প্রকাশনী, ১৯৭৯।

১৩. আমিনুল ইসলাম, gmwjg agZË I `kb, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৮৫।

১৪. আনিসুজ্জামান, gmwjg gvbm I evsjv mvwnZ¨, ঢাকা, পেপিরাস, ২০০১।

১৫. আনিসুজ্জামান, 'বাংলাদেশ ধর্ম, রাজনীতি ও রাষ্ট্র', m›`ig, নভেম্বর-১৯৯৬, জানু-১৯৯৭।

১৬. আনোয়ারচন্দ্র করিম, evsjv‡`‡ki evDj mgvR, mvwnZ¨ I msMxZ (c_g cKvk), ঢাকা, বর্ণায়ন, ২০০২।

১৭. আব্দুল হাফিজ, ‡jŠwKK ms¯‹vi I gvbemgvR, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৫।

১৮. আনোয়ার হোসেন ফকির, jvjb-m½xZ (c_g LÐ), PZ_ ms¯‹iY, ছেঁউড়িয়া (কুষ্টিয়া), লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটি, ২০০৮।

১৯. আনোয়ার হোসেন ফকির, jvjb-m½xZ (wØZxq LÐ) ZZxq ms¯‹iY, ছেঁউড়িয়া (কুষ্টিয়া), লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটি, ২০০৬।

২০. আনোয়ার হোসেন ফকির, jvjb-m½xZ (ZZxq LÐ) wØZxq ms¯‹iY, ছেঁউড়িয়া (কুষ্টিয়া), লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটি, ২০০৬।

২১. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী,১৯৮৫।

২২. আবুল কালাম (সম্পাদিত), mvgwRK weÁvb M‡elYv c×wZ I cwµqv, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।

২৩. আব্দুল খালেক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), mvgwRK weÁv‡b M‡elYv c×wZ, ঢাকা, হাসান বুক হাউস, ১৯৯৮।

২৪. আবুল আহসান চৌধুরী, jvjb mvB cm½ I Abm½, ঢাকা, সূচীপত্র, ২০০৪।

২৫. আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত), jvjb ¯§iKMš, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ১৯৭৪।

২৬. আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত), gwnb kv‡ni c‘vejx (c_g cKvk), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

২৭. আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত), jvjb mgM (c_g cKvk), ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০০৮।

২৮. আবুল আহসান চৌধুরী, evsjv‡`‡ki †jvKm½x‡Z †cg‡PZbv, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০১।

২৯. আবু জাফর, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব', m›`ig, মে-জুলাই ১৯৯৪, ঢাকা।

৩০. আবুল কাশেম ফজলুল হক, 'ধর্ম সম্পর্কে দু'একটি স্থূল কথা', ‰`wbK AvR‡Ki KvMR, ঢাকা, জানু-১৯৯৯, ঈদুল ফিতর বিশেষ সংখ্যা।

৩১. ইয়াসমিন আহমেদ, M‡elYv c×wZ I cwimsL¨vb cwiwPwZ, ঢাকা, AwRwRqv eK wW‡cv, 2000|

৩২. ইরফান হাবিব, fviZe‡li BwZnvm cm½, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২।

৩৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, evsjvi evDj I evDjMvb, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৯৭১।

৩৪. এ এফ এম আবুদল জলীল, ce evsjvi KlK we‡`vn, ঢাকা, এম আবদুল হক, ১৯৭৪।

৩৫. এম. আজিজুল হক, evsjvi KlK, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০৪।

৩৬. এস. আমিনুল ইসলাম, Dbqb wPš Ívi cvjve`j, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০৬।

৩৭. ওয়াকিল আহমেদ, evsjvi †jvK-ms¯‹wZ, ঢাকা, বাংলা একোডেমী, ১৯৭৪।

৩৮. ওয়াকিল আহমেদ, evDj Mvb, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০০০।

৩৯. ওয়াকিল আহমেদ, ‡jvKKjv ceÜvewj, ঢাকা, গতিধারা, ২০০১।

৪০. ওয়াকিল আহমেদ, 'মাইজভাণ্ডারি গান', লোককলা প্রবন্ধাবলী ঢাকা, গতিধারা, ফেব্রুয়ারি, ২০০১।

৪১. ওসমান গনী, ‡KviAv‡bi Av‡jv‡K Bmjvg RMr I mdxmgvR কলকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০২।

৪২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, k‡PZb¨PwiZvgZ, শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কালনা, হুগলি, ১৯৩৭।

৪৩. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ˆPZb¨ PwiZvgZ, কলকাতা, বঙ্গবাসী, ১৯৬৭।

৪৪. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, ag cm‡½, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪।

৪৫. কামাল সিদ্দিকী, evsjv‡`‡ki MvgxY `wi‡`¨i ivR‰bwZK A_bwZ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

৪৬. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, 'কৃষিতে ও কৃষক আন্দোলনে নমঃশূদ্র সমাজ', MYgw³ (2q el, 4_ msL¨v), ঢাকা, ২০০৫।

৪৭. খুরশিদ আলম, mgvR M‡elYv c×wZ, ঢাকা, মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ২০০০।

৪৮. গোলাম মুরশিদ, nvRvi eQ‡ii evOwj ms¯‹wZ, ঢাকা, অবসর, ২০০৬।

৪৯. গোপিকা রঞ্জন চক্রবর্তী, fevcvMjvi Rxeb I Mvb (c_g cKvk), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

৫০. গৌতম ভদ্র, Bgvg I wbkvb, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৯৯৪।

৫১. জামাল আহমেদ সিকদার, kvnvbkvn wRqvDj nK gvBRfvÛvix, চট্টগ্রাম, মাইজভাণ্ডার শরীফ, ২০০০।

৫২. তারকচন্দ্র সরকার, kx kx nwi jxjvgZ, গোপালগঞ্জ, ওড়াকান্দি, ১৯৯০।

৫৩. তারকচন্দ্র সরকার, kx kx gnvmsKxZb, গোপালগঞ্জ, ওড়াকান্দি ১৯৯১।

৫৪. তারাচাঁদ, fviZxq ms¯‹wZ‡Z Bmjv‡gi cfve, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

৫৫. তৃপ্তি ব্রহ্ম, ‡jvKRxe‡b evsjvi †jŠwKK agm½xZ I agxq †gjv, কলকাতা , ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৯।

৫৬. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ‡jvKvqZ ‘kb, কলাকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮।

৫৭. দীনেশচন্দ্র সেন, N‡ii K_v I hMmwnZ¨, ঢাকা, পড়ুয়া, ২০০৮।

৫৮. দীনেশচন্দ্র সেন, ivgvqYx K_v, ঢাকা, পড়ুয়া, ২০০৮।

৫৯. দীনেশচন্দ্র সেন, cvPxb ev½vjv mwn‡Z¨ gmjgv‡bi Ae‘vb, ঢাকা, পড়ুয়া, ২০০৮।

৬০. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদিত), ˆggbwmsn MxwZKv (1g LÐ) wØZxq ms¯‹iY, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০।

৬১. দুলাল চৌধুরী (সম্পাদিত), evsjvi †jvKms¯‹wZi wek‡Kvl, কলকাতা, আকাদেমি অব ফোকলোর, ২০০৪।

৬২. ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, ˆPZb¨ inm¨ mÜv‡b, কলকাতা, নাথ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭।

৬৩. ননীগোপাল গোস্বামী, ˆPZ‡b¨vËi h‡M †MŠoxq ˆeòe, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০০০।

৬৪. নন্দদুলাল মোহন্ত, gZqv A¤‡›‘vjb I ‘wjZ RvMiY, কলকাতা, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ২০০২।

৬৫. নিত্যানন্দ হালদার, RwZi RbK ¸i”Pv‘, কলকাতা, শ্রী শ্রীগুরুচাঁদ প্রিন্টিং প্রেস, ২০০১।

৬৬. নিত্যানন্দ হালদার, kxnwi ‘kb (ZZxq LÐ), ঠাকুরনগর, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৭।

৬৭. নারায়ন চন্দ্র মণ্ডল, ‘শিক্ষা বিস্তারে গুরুচাঁদ ঠাকুর’, ‘wjZ‘cY (c_g msL¨v), যশোর, ২০০০।

৬৮. নাজমীর নূর বেগম, mvgwRK M‡elYv cwiwPwZ, ঢাকা, নলেজ ভিউ, ১৯৮৮।

৬৯. প্রমথ চৌধুরী, ceÜ msMn, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৯৩।

৭০. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, †eŠ×ag I mwnZ¨, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৯৭।

৭১. পল্লব সেনগুপ্ত, cRv-cve‡Yi DrmK_v, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০১।

৭২. বিনোদ গোস্বামী, kxnwi fw³ evDj m½xZ (PZ_ ms¯‹iY), গোপালগঞ্জ, কল্যাণ প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯০।

৭৩. বিচরণ পাগল, kx kxnwi¸i”Pv‘ Pwi Î mav, ভারত, উত্তর চব্বিশ পরগনাঃ ২০০২।

৭৪. বদরুদ্দীন উমর, wPi¯vqx e‡›‘ve¯Í, ঢাকা, সুবর্ণ প্রকাশন, ১৩৮১।

৭৫. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, evsjv‡‘‡ki MvgvÂj I †kYx msMvg, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৩।

৭৬. বদরুদ্দীন উমর, mvs¯‹wZK mv¤cv`wqKZv, ঢাকা, গ্রন্থনা, ১৯৬৯।

৭৭. বদরুদ্দীন উমর, mv¤cv`wqKZv, ঢাকা, আবু নাহিদ, ১৯৭০।

৭৮. বদরুদ্দীন উমর, ms¯‹wZi msKU, ঢাকা, আবু নাহিদ, ১৯৭০।

৭৯. বুলবন ওসমান, ms¯‹wZ I ms¯‹wZË, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭।

৮০. বদরুদ্দীন আলম খান (সম্পাদিত) evsjv‡`k: ag I mgvR, চট্টগ্রাম, সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৮৮।

৮১. বিনয় ঘোষ, evsjvi mvgvwRK BwZnv‡mi aviv, ঢাকা, বুক ক্লাব, ২০০০।

৮২. বিরাট বৈরাগ্য, gZqv mvwnZ¨ cwiµgv, নদীয়া, ধরমপুর, ১৯৯৯।

৮৩. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, †MŠoxq ˆeòe m¤cª`vq fw³im I Aj¼vikv¯¿, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৩।

৮৪. বেনজীন খান, 'ভগমেনে ধর্ম ও তাঁদের কথা', MYgyw³, লোকধর্ম সংখ্যা, ঢাকা, গণমুক্তি সংস্কৃতিক পরিষদ, মার্চ ২০০৮।

৮৫. বরচন্দকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), e½xq †jvKms¯‹wZ †Kvl, কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৫।

৮৬. মনোমোহন দত্ত, gjqv ev m¤ve m½xZ wesk‹wZZg ms¯‹iY, সাতমোড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), আনন্দ আশ্রম, ২০০৬।

৮৭. মনোমোহন দত্ত, jxjv inm¨, mvZ‡gvo (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), আনন্দ আশ্রম, ১৯৭৭।

৮৮. মঙ্গলময় দাশঠাকুর, kxkxnwi, gnv-msKxËb, c_g cKvk, গোপালগঞ্জ, ওড়াকান্দি (ঠাকুরবাড়ি), ২০০৩।

৮৯. মতুয়া মহাসংঘ (সম্পাদিত), gZqv m½xZ (১ম খণ্ড), ওড়াকান্দিঃ মতুয়া মহাসংঘ, ১৯৪৫।

৯০. মহানন্দ হালদার, kx kx ¸i"Pv`PwiZ, খুলনা, হরিগুরুচ্চাঁদ আশ্রম, ১৯৪৩।

৯১. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, gvBRfvÛvix `kb, DrcwË, weKvk I we‡klZ, চট্টগ্রামঃ মাইজভান্ডার শরীফ, ২০০৫।

৯২. মাওলানা আবদুল আওয়াল, a‡gi bv‡g AcivRbxwZ, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

৯৩. মুহম্মদ আবদুল জলিল, †jvKms¯‹wZi bvbv cm½, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

৯৪. মনোমোহন দত্ত, gjqv, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আনন্দ আশ্রয়, ২০০৬।

৯৫. মণি বর্ধন, evsjvi †jvKbZ¨ I MxwZ‰ewPÎ¨, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৪।

৯৬. মুনতাসীর মামুন, Ewbk kZ‡K cee‡½i mgvR, ঢাকা , সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৬।

৯৭. মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), wPi¯vqx e‡›`ve¯Í I evOvjx mgvR, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৫।

৯৮. মুস্তাফা নূর উল ইসলাম (সম্পাদিত), Avengvb evsjv, ঢাকা, মোঃ আমিনুল হক, ১৯৯৩।

৯৯. মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য (সম্পা.), evsjv GKv‡Wgx e¨enwiK evsjv Awfavb, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

১০০. মিনার মনসুর, 'বাংলাদেশঃ সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি', Avengvb evsjv, ঢাকা, এম. নোমান আহমদ, ১৯৯৩।

১০১. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, mgvRweÁvb cwiwPwZ, ঢাকা, হাসান বুক হাউজ, ১৯৯৪।

১০২. মুরশিদ আল হাসান, mvgwRK M‡elYv:c×wZ cwµqv we‡kølY, ঢাকা, কল্লোল প্রকাশনী, ২০০৫।

১০৩. যতীন সরকার (সম্পাদিত), RvjvjMxwZKv msMn, ঢাকা, নন্দিত, ২০০৫।

১০৪. যতীন সরকার, 'বাঙালির লৌকক ধর্মের মর্মান্বেষণ', wbišÍi (lô msL¨v), মীত সংকলন, পৌষ, ২০০৫।

১০৫. রফিকুল ইসলাম, 'উপমহাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ', ‰'wbK g³KÉ, ১৬ ডিসেম্বর, ঢাকা, ১৯৯৭।

১০৬. রমনী গোস্বামী, i|c msMxZ(c_g cKvk), গোপালগঞ্জ, ওড়াকান্দি (ঠাকুরবাড়ি), ২০০৩।

১০৭. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, ‡MŠ‡oi BwZnvm, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯।

১০৮. রমাকান্ত চক্রবর্তী, e‡½ ˆeòe ag, কলকাতা, অনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৬।

১০৯. রতন কুমার নন্দী, KZvfRv ag I mvwnZ¨, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮।

১১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, iex›' iPbvejx (3q LÐ), কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৮৫।

১১১. রাজ গোবিন্দ, VvKievYx wbZ¨vb›' †MvmvBi RxebPwiZ I jxjv K_v, সিলেট, নিত্যানন্দ গোঁসাই'র আশ্রম, ১৯৬৫।

১১২. রমেন্দ্র নাথ ঘোষ, fviZxq 'kb (wØZxq ms¯‹iY), ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০১৫।

১১৩. লুইস হেনরি মর্গান, Aw'g mgvR, ঢাকা, অবসর, ২০০০।

১১৪. শক্তিনাথ ঝাঁ, evDj-dwKi aŸs‡mi Av‡›'vj‡bi BwZeË, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ২০০১।

১১৫. শিমুল মাহমুদ, 'বাংলাদেশের ছোটগল্প, উত্তরণ ও বাক পরিবর্তন', wPý (2q msL¨v), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি ২০০১।

১১৬. শীলা বসাক, evsjvi eZcveY, কলকাতা , পুস্তক বিপণি, ২০০০।

১১৭. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, evsjv mvwn‡Z¨i cUfwgi|‡c K‡qKwU agmvabv, কলকাতা, ভারতি, ১৯৯৬।

১১৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), evsjv wcwWqv, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪।

১১৯. সালাউদ্দীন আইয়ূব, ms¯‹wZi wRÁvmv, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

১২০. সুধীর চক্রবর্তী, evZ¨ †jvKvqZ jvjb, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮।

১২১. সুধীর চক্রবর্তী, evDj dwKi K_v, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০১।

১২২. সুধীর চক্রবর্তী, evsjvi †MŠY ag mv‡neabx I ejvnwo, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৩।

১২৩. সুধীর চক্রবর্তী, Mfxi wbRb c‡_ (c_g ms¯‹iY), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৯।

১২৪. সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদিত), evsjvi evDj dwKi, প্রথম প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯।

১২৫. সুবীরা জায়সবাল, ‰eòe a‡gi DrcwË I µgweKvk, কলকাতা, কেপি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৯৩।

১২৬. সেলিম জাহাঙ্গীর, মাইজভাণ্ডারি সন্দর্শন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

১২৭. সেলিম জাহাঙ্গীর, MvDmj AvRg gvBRfvÐvix kZe‡li Av‡jv‡K, চট্টগ্রাম, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী, ২০০৭।

১২৮. সনৎ কুমার মিত্র (সম্পাদিত), evDj jvjb ie›`bv_, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫।

১২৯. সোমা শেঠ, cm½: evsjvi †jvKag, কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭।

১৩০. সোমেন চন্দ, †mv‡gb P›` I Zvi iPbv msMn, কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৩।

১৩১. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), evsjv GKv‡Wgx PwiZwfavb (2q ms¯‹iY) ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।

১৩২. সুপ্রকাশ রায়, fvi‡Zi KlK we‡`vn I MYZwšK msMvg : Ebwesk kZvãx, কলকাতা, ডি.এন.বি.এ. ব্রাদার্স, ১৯৭২।

১৩৩. সুকুমার সেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), kx kx‰PZb¨PwiZvgZ, কলকাতা, আনন্দ পাবিলশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩।

১৩৪. সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস, 'গ্রামীণ রেনেসাঁর জনক, গুরুচাঁদ ঠাকুর', gZqvgnvmsN cwÎKv (msL¨v-49), উত্তর ২৪ পরগনা, ভারত, ২০০১।

১৩৫. স্বপন বসু, MY Am‡šÍvl I Dwbk kZ‡Ki evOvjxmgvR, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৭।

১৩৬. স্বরূপেন্দু সরকার, kx kxnwiPv‡`i RxebK_v, রাজশাহী , কঙ্কাপ্রকাশ, ২০০৬।

১৩৭. স্বরূপেন্দু সরকার, mgvR ms¯‹v‡i gZqv, রাজশাহী, কঙ্কা প্রকাশনী, ২০০১।

১৩৮. স্বরোচিষ সরকার, 'নমঃশূদ্র জাগরণের অগ্রদূত গুরুচাঁদ ঠাকুর', MYgw³ (2q el, PZ_ msL¨v) ঢাকা, ২০০৫।

১৩৯. স্বরোচিষ সরকার, 'অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি', evsjv‡`k GwkqwUK †mvmvBwU cwÎKv (cÂ`k LÐ, 2q msL¨v), ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

১৪০. ক্ষিতিমোহন সেন, evsjvi evDj, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪।

১৪১. *Everyman's Encyclopedia*, London, JM Dent & Sons, 1974.

১৪২. Gordon Marshal (etd), *A dictionary of Sociology*, Oxford, Oxford University Press, 1998.

১৪৩. Irvin M Zetlin, *Ideology and the Development of Sociooological Theory*, Delhi, Prentice Hall of India Limited, Delhi, 2001.

১৪৪. J. Habermas, *Towards a Rational Society*, London, Heinemann Educatioonal Book, 1971.

১৪৫. L. A. Coser, Masters of Sociological Thought, NY, Harcourt Brace, Jovanovich , Inc. 1971.

১৪৬. Maulana Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, India, Orient Long Man, 1988.

১৪৭. Muhammad Enamul Haq, *A History of Sufi-ism in Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1995.

১৪৮. M. Francis, *Modern Sociological Theory*, Delhi, Oxford University Press, 1982.

১৪৯. Pramatha Nath Bose, *A History of Hindu Civilization During British Rule*, Vol. I Calcutta, 1894.

১৫০. Raymond Aron, *Main Currents in Sociological Thought, Vol-I, II and III*, England, Penguin Books, 1965.

১৫১. R. K. Merton, *Social Theory and The Social Structure*, Glence, Free Press, 1957.

১৫২. Theodor Abel, *TheFoundation of Sociogical Theory*, NY, Random House, 1970.

পরিশিষ্ট- ১
উত্তরদাতাগণের নামের তালিকা

১। আলোক দাস, পিতা : রচ্চইতন দাস, গ্রাম- মির্জাপুর, ডাকঘর- মির্জাপুর, উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা- খুলনা, পেশা- ঠিকাদার। সাক্ষাৎকারের স্থান : নিজ বাড়ি, তারিখ : ৮ অক্টোবর, ২০১৬খ্রি.।

২। মণিশান্ত মন্ডল, অধ্যক্ষ, মশিয়াহাটী ডিগ্রি কলেজ, মনিরামপুর, যশোর। সাক্ষাৎকারের স্থান : অধ্যক্ষের কার্যালয়, তারিখ : ১৩ অক্টোবর, ২০১৬খ্রি.।

৩। অনিন্দ সুন্দর মন্ডল, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ডুমুরিয়া মহাবিদ্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা। সাক্ষাৎকারের স্থান : নিজ বাড়ি, তারিখ : ১৭ অক্টোবর, ২০১৬খ্রি.।

৪। শ্রীমতি মালতি মন্ডল, স্বামী- মৃত. শান্তিরঞ্জন মন্ডল, গ্রাম- পাঙ্গাশিয়া, ডাকঘর- পাঙ্গাশিয়া, উপজেলা- চিতলমারী, জেলা- বাগেরহাট, পেশা- গৃহিণী, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ২১ অক্টোবর, ২০১৬খ্রি.

৫। শুম্ভনাথ মন্ডল, পিতা- কালিদাস মন্ডল, গ্রাম- কাশিয়াডাঙ্গা, ডাকঘর- খলিশখালী, উপজেলা- তালা, জেলা- সাতক্ষীরা, পেশা- সার্ভেয়ার, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ২৫ অক্টোবর, ২০১৬খ্রি.

৬। অসীত বরণ মন্ডল, পিতা- নিমাই মণ্ডল, গ্রাম- দেবীতলা, ডাকঘর- দেবীতলা, উপজেলা- বটিয়াঘাটা, জেলা- খুলনা, পেশা- শিক্ষকতা, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ৩১ অক্টোবর, ২০১৬খ্রি.।

৭। ডাঃ সুধাংশু শেখর মালাকার, পিতা- মৃত. শরৎ চন্দ্র মালাকার, গ্রাম- কালিনগর, ডাকঘর- তেরখাদা, উপজেলা- তেরখাদা, জেলা- খুলনা, পেশা- চিকিৎসক, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ চেম্বার, তারিখ- ৫ নভেম্বর, ২০১৬খ্রি.।

৮। পবিত্র সরকার, পিতা- মৃত. রচ্চইতন সরকার, গ্রাম- তাহেরপুর, ডাকঘর- চন্ডিপুর, উপজেলা- মণিরামপুর, জেলা- যশোর, পেশা- সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ১১ নভেম্বর, ২০১৬খ্রি.।

৯। পরশ বিশ্বাস, পিতা-জয়ন্ত বিশ্বাস, গ্রাম- কুলুটিয়া, ডাকঘর- মশিয়াহাটী, উপজেলা- মনিরামপুর, জেলা- যশোর, পেশা- মুক্তিযোদ্ধা, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ১৮ নভেম্বর, ২০১৬খ্রি.।

১০। অপর্ণা গাইন (সাবেক মহিলা ইউপি সদস্য), পিতা- মোহন গাইন, গ্রাম- মির্জাপুর, ডাকঘর- মির্জাপুর, উপজেলা- ডুমুরিয়া, জেলা- খুলনা, পেশা- গৃহিণী, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ২৬ নভেম্বর, ২০১৬খ্রি.।

১১। সন্তোষ সরদার, পিতা- অসিত সরদার, গ্রাম- মণিরামপুর, ডাকঘর- মণিরামপুর, উপজেলা- মণিরামপুর, জেলা- যশোর, পেশা- ব্যাংকার, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ৩০ নভেম্বর, ২০১৬খ্রি.।

১২। প্রফুল্ল কুমার রায়, পিতা- প্রবোধ চন্দ্র রায়, গ্রাম- কৈয়াবাজার, ডাকঘর- কৈয়াবাজার, উপজেলা- বটিয়াঘাটা, জেলা- খুলনা, পেশা- কৃষি, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ৪ ডিসেম্বর, ২০১৬খ্রি.।

পরিশিষ্ট- ১

উত্তরদাতাগণের নামের তালিকা

১৩। বিপুল বিহারী হালদার, পিতা- মৃত বঙ্কিম বিহারী হালদার, গ্রাম- আরামকাঠী, ডাকঘর- স্বরূপকাঠী, উপজেলা- স্বরূপকাঠী, জেলা- পিরোজপুর, পেশা- ব্যবসা, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ দোকান, তারিখ- ১০ ডিসেম্বর, ২০১৬খ্রি.।

১৪। মানিক গোসাই, পিতা- রসময় বিশ্বাস, গ্রাম- মাগুরা, ডাকঘর- বিনেরপোতা, উপজেলা- সাতক্ষীরা সদর, জেলা- সাতক্ষীরা, পেশা- ক্ষুদ্র পান ব্যবসায়ী, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৬খ্রি.।

১৫। বিষ্ণুপদ বাগচি, পিতা- অজিত কুমার বাগচি, গ্রাম- বাঁশতলী, ডাকঘর- বাঁশতলী, উপজেলা- রামপাল, জেলা- বাগেরহাট, পেশা- হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ চিকিৎসালয়, তারিখ- ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬খ্রি.।

১৬। দুলাল দাস, পিতা- গুরুপদ দাস, গ্রাম- খানপুর, ডাকঘর- তালা, উপজেলা- তালা, জেলা- সাতক্ষীরা, পেশা- কবিরাজি, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৬খ্রি.।

১৭। রবীন্দ্রনাথ কর্মকার, পিতা- পঞ্চুরাম কর্মকার, গ্রাম- শিমুলবাড়িয়া, ডাকঘর- এল্লারচর, উপজেলা- সাতক্ষীরা সদর, জেলা- সাতক্ষীরা, পেশা- কৃষি, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬খ্রি.।

১৮। মিনতি রাণী মন্ডল, পিতা- বিমলেন্দু মন্ডল, গ্রাম- বড়দিয়া, ডাকঘর- বড়দিয়া, উপজেলা- রামপাল, জেলা- বাগেরহাট, পেশা- শিক্ষকতা, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ২ জানুয়ারি, ২০১৭খ্রি.।

১৯। বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, পিতা- মৃত. নিরঞ্জন বিশ্বাস, ৯ নং জলিল স্মরণি, ছোট বয়রা, খুলনা, পেশা- কৃষি কর্মকর্তা, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ বাড়ি, তারিখ- ৫ জানুয়ারি, ২০১৭খ্রি.।

২০। সন্দীপন মন্ডল, পিতা- অনিন্দ মণ্ডল, গ্রাম- রংপুর, ডাকঘর- রংপুর, উপজেলা- ডুমুরিয়া, জেলা- খুলনা, পেশা- গবেষণা, সাক্ষাৎকারের স্থান- নিজ কার্যালয়, তারিখ- ১০ জানুয়ারি, ২০১৭খ্রি.।

পরিশিষ্ট-২

মতুয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের জন্য প্রণিত গবেষণা প্রশ্ন।

১। কি কারণে মতুয়া সম্প্রদায়কে একটি বিশেষ সম্প্রদায় বলা হচ্ছে? (প্রশ্নটি সকলের জন্য)

২। লোকধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে মতুয়া সম্প্রদায়ের সাথে অন্যান্য লোকধর্মীয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক কেমন? (বিশেষজ্ঞ)

৩। বাঙালি সংস্কৃতিতে মতুয়া সম্প্রদায় বিশেষ সম্প্রদায় হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার কারণ কি? (বিশেষজ্ঞ)

৪। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগে মতুয়া সম্প্রদায়ের কোন ভূমিকা আছে কি? (বিশেষজ্ঞ)

৫। সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় মতুয়া সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে কিভাবে কাজ করে? (বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ লোক)

৬। ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং চার্বাক মতবাদের সাথে মতুয়া আন্দোলনের সাদৃশ্য কোথায়? (বিশেষজ্ঞ)

৭। সুফি, বৈষ্ণব, বাউলেরা যেমন গুরুবাদী মতুয়ারা কি সে রকম? আপনার মতে কি বলে?

৮। সুফি, বৈষ্ণব বাউলেরা যেমন সঙ্গীতে, আচারে, আদর্শে কিছুটা আলাদা মতুয়া সম্প্রদায়েও কি সে ধরণের কিছু লক্ষ্য করা যায়?

৯। মতুয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা কি ধরণের খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত ? তাদের খাদ্যাভ্যাসে সার্বজনীন লক্ষণ আছে কিনা? আপনার মতামত দিন।

১০। বাংলাদেশে বসবাসরত মতুয়া সম্প্রদায় অধিকার আদায়ে সাংগঠনিকভাবে কাজ করে কিনা? ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োগে কোন ধরণের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় কি না?

১১। পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহারে মতুয়ারা কেমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে? তাদের পোষাকে কি অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম নিরপেক্ষতার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়?

১২। বাংলাদেশের সমাজে মতুয়া সম্প্রদায়ের সমাজ সংস্কারের দিকগুলো গুলো কি কি?

১৩। আপনার দৃষ্টিতে মতুয়া সামাজিক আন্দোলন কি ব্যর্থ হয়েছে? যদি ব্যর্থ হয়ে থাকলে এ ব্যর্থতার কারণগুলো আপনার কাছে কি রকম?

১৪। আপনার মতে মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান কেমন? এ অবস্থান কি সমাজের জন্য ইতিবাচক?

১৫। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় আচার-বিশ্বাস পালনে মতুয়ারা কি কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়? যদি হয় তবে সেটি কেমন?

পরিশিষ্ট-৩

গবেষণা প্রশ্নমালা

মতুয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের জন্য প্রণিত গবেষণা প্রশ্নমালা।

ক অংশ

(তথ্য সংগ্রহকারীর পরিচয়)

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ....মোবাইল নং..........................স্বাক্ষর ও তারিখ ....

গ্রাম:.....................................পোস্ট...........................ইউনিয়ন/পৌরসভা:...................................

ওয়ার্ড নং: .... উপজেলা:............................ জেলা: ....

খ অংশ

(তথ্য প্রদানকারীর পরিচয়)

১.তথ্য প্রদানকারীর নাম: ....মোবাইল নং..

বয়স: .... শিক্ষা............................ গ্রাম ....

পোস্ট .... ইউনিয়ন/পৌরসভা .... ওয়ার্ড নং ....

উপজেলা .... জেলা ....

২.লিঙ্গ (টিক দিন): ১=পুরুষ ২=নারী পেশা....................................

৩. বৈবাহিক অবস্থা: ১ = বিবাহিত, ২ =অবিবাহিত, ৩ = বিধবা/বিপত্নীক, ৪ = বিচ্ছিন্ন, ৫ = তালাক/ছাড়াছাড়ি, ৬ = পরিত্যক্ত

৪. ধর্ম: ১=সনাতন, ২= সুক্ষ্ম সনাতন ধর্ম ৩=সম্প্রদায়, ৪=খ্রিষ্টান, ৫=অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

গ অংশ

(তথ্য প্রদানকারীর জন্য প্রদত্ত প্রশ্নমালা)

১. আর্থ-সামাজিক জীবন ধারার কোন প্রেক্ষাপটে মতুয়া সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে অনিবার্য হয়ে পড়ে? বলুন।

২. বর্তমানে মতুয়া সম্প্রদায়ে কোন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ বেশি পাওয়া যায়?

৩. আধুনিক শিক্ষা এবং প্রযুক্তির প্রভাবে মতুয়া সম্প্রদায়ের জীবন যাপনে কেমন ধরণের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে?

৪. যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মতুয়া সম্প্রদায় তাদের মূল দর্শনের সাথে কতটুকু খাপ খাওয়াতে সক্ষম হচ্ছেন?

৫. আপনি যদি পূর্বের সনাতন ধারা ত্যাগ করে থাকেন তাহলে কেন সেটি করেছেন? বলুন।

৬. মতুয়া সম্প্রদায়ে অতীত ও বর্তমানে শিক্ষিত লোকের আনুপাতিক হার কেমন? তাদের শিক্ষার অধিকার ফিরে আসে কখন এবং কার নেতৃত্বে?

৭. মতুয়া ধর্মীয় আন্দোলন কেন পুণ্ড্র ক্ষত্রিয় এবং নমঃশূদ্রের আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ করে? বর্ণনা করুন।

৮. মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর কিভাবে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলেন? নিজের ভাষায় বলুন।

পরিশিষ্ট-৩

মতুয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের জন্য প্রণিত গবেষণা প্রশ্নমালা।

৯. শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর গেপালগঞ্জের সফলানগরীতে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও সেখানকার ওড়াকান্দি গ্রাম কিভাবে মতুয়া সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান হয়ে উঠল?

১০. নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য তিনি কখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং নির্যাতিত মানুষকে তিনি কোন পথ দেখিয়েছিলেন?

১১. অনেকের মতে হরিচাঁদ ঠাকুর, গৌতমবুদ্ধ এবং শ্রী চৈতন্য অভিন্ন সত্ত্বা? আপনি যদি এটি সত্য মনে করেন তাহলে এ তথ্যের সত্যতার সপক্ষে যুক্তি দেখান।

১২. মতুয়া সম্প্রদায়ের দ্বাদশ আজ্ঞা খুবই গুরচত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ কী। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? আলোচনা করচন।

১৩. মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রায়েগিক প্রবক্তা গুরচ্চাঁদ ঠাকুর কেন শিক্ষা আন্দোলনের উপর সর্বাপেক্ষা গুরচত্বারোপ করেন? যুক্তিসহকারে আপনার মতামত ব্যক্ত করচন।

১৪. মতুয়া সম্প্রদায়ের সর্ব প্রধান আকর গ্রন্থ বা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কি? এটি কোন ভাষায় রচিত? এর রচয়তির নাম কী?

১৫. অনেকের মতে মতুয়া একটি আন্দোলনের নাম। আপনি কি এ বিষয়ে এক মত পোষণ করেন? প্রমাণসহ আপনার উত্তরের যথার্থতা বিচার করচন।

১৬. উচ্চবর্গ থেকে যারা হরিচাঁদ ভক্ত হয়েছিলেন তাঁরা কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেটি হয়েছিল?

১৭. অন্যান্য ধর্মের মানুষের প্রতি মতুয়া সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন? যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করচন।

১৮. সাধারণ মানুষের মঙ্গলের কথা ভেবে মতুয়া সম্প্রদায় কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে? টিক দিন।
১ = শিক্ষা, ২ = স্বাস্থ্য, ৩ = ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন, ৪ = কৃষি, ৫ = পশুপালন, ৬ = মৎস্য, ৭ = ঋণ, ৮ = সেফটিনেট (ভিজিএফ, ভিজিডি..), ৯ = বিদ্যুৎ, ১০ = ত্রাণ, ১১ = আইনী সহায়তা, ১২ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

১৯. মতুয়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের সামাজিক ও ধর্মীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

২০. মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠায় গুরচ্চাঁদ প্রদত্ত শ্লোগানগুলো কী কী?

২১. শ্রী শ্রী গুরচ্চাঁদ ঠাকুর শিক্ষা ট্রাস্ট কখন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলুন?

২২. মতুয়া পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েরা স্কুলে শিক্ষাগ্রহণের সময় বর্তমানে বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন কিনা?

২৩. সহশিক্ষা ও সহ অবস্থানে মতুয়া সম্প্রদায়ের নির্দেশনা কী রকম?

২৪. মতুয়া সম্প্রদায়ে হরি-গুরচ্চাঁদ প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো কী কী?

২৫. মতুয়া সম্প্রদায়ে সৃষ্ট সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে বেরিয়ে আসবার কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় কিনা? যদি যায় তবে তা কী রকম ভাবে সম্ভব?

পরিশিষ্ট-৩

মতুয়া সম্প্রদায়ের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের জন্য প্রণিত গবেষণা প্রশ্নমালা।

২৬. সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে সেবা পেতে/নিতে গিয়ে মতুয়া পরিবারকে কোন ধরণের তদবীর করতে হয় কিনা? যদি করতে হযতবে তা কেমন ধরনের?

২৭. স্বাধীন বাংলাদেশে উচ্চবর্গীয় বৈষম্যের কারণে মতুয়া পরিবারের সদস্যদের বর্তমানে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে কোনো রূপ বাঁধার মুখোমুখী হতে হয় কিনা?

২৮. অতীতে উচ্চবর্গ কর্তৃক নিম্নবর্গীয় মানুষগুলো কি ধরনের বৈষম্যের মুখোমুখি হতেন?
১ = মিথ্যা মামলা, ২ = ফসলের ক্ষতি, ৩ = নারী নির্যাতন, ৪ = শিশু নির্যাতন, ৫ = শারীরিক নির্যাতন, ৬ = ভয়-ভীতি প্রদর্শন/প্রাণ নাশের হুমকি/মানসিক নির্যাতন, ৭ = প্রতারণা, ৮ = পশু সম্পদের ক্ষতি, ৯ = মৎস্য সম্পদে ক্ষতি, ১০ = ধর্মীয় কাজে বাধাদান, ১১ = আর্থিক ক্ষতি, ১১ = সামাজিক কাজে বাধাদান, ১২ = অন্যান্য (উলেখ করুন) ....

২৯. উচ্চবর্গের অনিয়মের বিরূদ্ধে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কখনো প্রতিবাদ করেছেন কি ? হ্যাঁ-১, না-২।

৩০. গুরচ্চাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে নিম্নবর্গের মানুষেরা কখন এবং কিভাবে শিক্ষা এবং চাকুরীর অধিকার ফিরে পায়?

৩১. একজন হরিভক্ত হিসেবে মতুয়া সমাজের উন্নয়নে আপনার কোনো সুপারিশ আছে কিনা?

৩২. বিধবা মহিলাদের সাদা বস্ত্র ধারণ এবং বিবাহিত মহিলাদের শাখা সিঁদুর বব্যহার বাধ্যতামূলক কিনা? আপনার মতামত দিন।

৩৩. মতয়া সম্প্রদায়ীরা কোন আইনে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন? আপনার মতামত ব্যক্ত করচ্ন।

৩৪. 'মতুয়া আন্দোলন বৈষম্যমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখে'—তাহলে কি সব ধর্মমতের লোকেরা এ মতে আসতে পারবে? যদি পারে তাহলে কোন প্রক্রিয়ায়? মতামত দিন।

৩৫. অন্য কিছু জানার/ বলার থাকলে লিখুন

পরিশিষ্ট-৪

গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরণের ছবি

মতুয়া প্রবর্তক শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও তার সহধর্মিনী
উৎস ঃ দুলাল গোসাই, মাগুরা কামারপাড়া, সাতক্ষীরা থেকে সংগৃহীত, তারিখ- ৮ নভেম্বর, ২০১৬খ্রি.

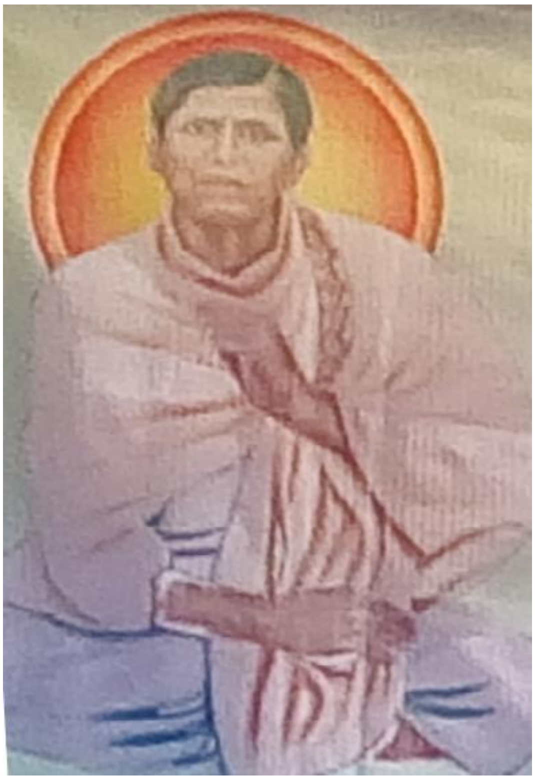

মতুয়া প্রচারক শ্রী শ্রী গুরচ্চাঁদ ঠাকুর
উৎস ঃ দুলাল গোসাই, মাগুরা কামারপাড়া, সাতক্ষীরা থেকে সংগৃহীত, তারিখ- ১২ আগস্ট, ২০১৫খ্রি.

পরিশিষ্ট-৪

মতুয়া সম্প্রদায়ের ওড়াকান্দি মন্দির
উৎস ঃ ডাঃ রাম বিশ্বাস কর্তৃক সরবরাহকৃত, ১৯/০৪/২০১৭ ইং।

মশিয়াহাটী, মনিরামপুর, যশোরে লেখক ও গবেষক শুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাসকে শতবর্ষী পদ্মাবতী বিশ্বাসের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।
উৎসঃ ছবিটি গবেষক কর্তৃক সরাসরি অনুষ্ঠান স্থল থেকে ক্যামেরা বন্দি করা হয়েছে, ১৫/০২/২০১৭

পরিশিষ্ট-৪

গুরুচাঁদ ঠাকুর শিক্ষা ট্রাস্টের অতিথিদের একাংশের ছবি।
উৎসঃ ছবিটি গবেষক কর্তৃক সরাসরি অনুষ্ঠান স্থল থেকে ক্যামেরা বন্দি করা হয়েছে, ১৭/০২/২০১৭

সুক্ষ্ম সনাতন ধর্মের (মতুয়া ধর্ম) মহা সম্মেলনে হরিসংকীর্তন পরিবেশনকারী মতুয়ার দল
উৎস ঃ ছবিটি গবেষকের সহযোগী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস লোহাগড়া নড়াইলে ক্যামেরাবন্দি হয় ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭খ্রি.

পরিশিষ্ট-৪

দারিয়ারকূল, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জের মতুয়া মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথি মতুয়া গবেষক ড. বিরাট কুমার বৈরাগ্য ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

উৎস ঃ ছবিটি গবেষকের সহযোগী রামকৃষ্ঞ বিশ্বাস লোহাগড়া, নড়াইলে ক্যামেরাবন্দি হয় ১০ মার্চ, ২০১৭খ্রি.

গুরচ্চাঁদ শিক্ষা ট্রাস্টে বক্তব্যরত মতুয়া মহাসংঘের সহ-সভাপতি প্রশান্ত হালদার

উৎসঃ ছবিটি গবেষক কর্তৃক সরাসরি অনুষ্ঠান স্থল থেকে ক্যামেরা বন্দি করা হয়েছে, ১৭/০২/২০১৭

পরিশিষ্ট-৪

ঐতিহ্যবাহী মশিয়াহাটী মহাবিদ্যালয়ের মতুয়াভক্ত অধ্যক্ষ মনিশান্ত মন্ডল, গবেষক এবং অন্য কয়েকজন শিক্ষক
উৎস ঃ ছবিটি কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থানকালে ক্যামেরাবন্দি করা হয় তারিখ- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

একজন মতুয়া গোসাই ও তার কয়েকজন সঙ্গী
উৎস ঃ ছবিটি গবেষকের সহযোগী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস লোহাগড়া নড়াইল কর্তৃক সরবরাহ করা হয় ২৭ মার্চ, ২০১৭খ্রি.

পরিশিষ্ট-৪

গবেষণা এলাকার মানচিত্র

উৎস ঃ ছবিটি ১৫ এপ্রিল, ২০১৭খ্রি. ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত এবং গবেষণা এলাকা চিহ্নিত করা হয় স্বহস্তে

সমাপ্ত